দ্বিতীয় অধ্যায়

বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেন : সমকালীন প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেন : সমকালীন প্রেক্ষাপট

বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) আবির্ভাবকাল ছিল ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর এক সন্ধিলগ্নে। তখন বাংলা তথা ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চিত্রে পরিবর্তনের হাওয়া লেগে নতুন প্রগতির পথে হাঁটা শুরু হয়। উনিশ শতকের গোড়া থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত হয়ে পুরুষ নারীর যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে উদ্যোগী হয়। ধীরে ধীরে নারীও এগিয়ে চলার পথ তৈরি করতে থাকে। এসব একদিনে বা একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হয়নি। তাই দেখে নেওয়া যাক্ বাংলা তথা ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-শিক্ষা চিত্রের পরিবর্তন ক্ষণকে। প্রথমেই দীর্ঘদিনের এক তারে বাঁধা সমাজজীবনের পালা পরিবর্তনের রূপটি চিনে নেওয়া যাক্।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে 'নবজাগরণের কাল' বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেও সমাজজীবনে চিরাচরিত প্রথা, ঐতিহ্যের নামে কুসংস্কারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ছিল প্রবল। তাই সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতবাসীকে নূতন প্রগতিমূলক সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভের মধ্যে দিয়ে গতানুগতিকতার পথ থেকে সরে এসে এক অনুসন্ধানী, মানবিক মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রেই। সেই নূতন যুগে নানা ধর্মীয় আন্দোলন সংঘটিত হয়, যা সামাজিক চালচিত্রটাকেও বদলে দিতে শুরু করে। ধর্ম ও সমাজের মধ্যে গভীর যোগসূত্র থাকায় সামাজিক সংস্কারের জন্য ধর্মীয় সংস্কারের পরিবর্তনের কথা সেদিনের সমাজ-সংস্কারকবৃন্দ গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এর ফলে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও তাঁর অনুগামীদের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ্ প্রথা রোধ হয়। আর এর ফলে নারী পেল জীবন ধারণের মৌলিক অধিকার।

এর সূত্র ধরে সমাজে বিধবা নারীর প্রতি সামাজিক রীতিনীতি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারী করে বৈধব্য জীবন কণ্টকময় করে তোলা হয়। বিধবার না ছিল পারিবারিক মর্যাদা, না ছিল সামাজিক মর্যাদা। পরিবারের ভিতরে বাইরে নানা প্রলোভন, নানা পাপাচারের দায় এসে পড়ত নারীর ওপর। পুরুষ থাকত নিষ্কলঙ্ক। বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এই

বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে লিখেছিলেন —"অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত।" *(পৃ: ৮৩৯, বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কামিনী প্রকাশনালয়, কলিকাতা, ১৩৯৯)*

বিধবা বিবাহ চালু করার পূর্বে বিদ্যাসাগর গুরুত্ব দিলেন বাল্যবিবাহ রোধে। কারণ বাল্যবিবাহই বহু সংখ্যক বালবিধবার দুর্দশার মূল কারণ। এই বিষয়ে ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের লেখা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। এরপর বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্র সভা-সমিতির মাধ্যমে তীব্র জনমত গড়ে উঠতে থাকে। রক্ষণশীল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিধবাবিবাহ আন্দোলন এক যুগান্তকারী প্রচেষ্টা। ১৮৫৬ সালে নানা আন্দোলনের পর বিধবাবিবাহ আইনটি গৃহীত হয়। বেঙ্গল স্পেকটেটর (১৮৪২), তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩), সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), বামাবোধিনী (১৮৬৩) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা ছাড়াও ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য উদার মতাবলম্বী ব্যক্তিবৃন্দ সেদিন বিদ্যাসাগরের পাশে ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মত তখনও অনেকেই এর বিরুদ্ধতা করায় "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলেও সমাজে তা তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। বিধবারা অনেকেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে বারাঙ্গনায় পরিণত হত এবং কুলবধূদের অপেক্ষা বকনাপিয়ারী, কোকড়াপিয়ারী, দামড়াগোপী, ওমদা খানুম এদেরই বেশী চিনত।" *(পৃ: ৭২, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, বাঙ্গালী জীবনে রমণী, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ১২০০ সংস্করণ)।*

ঐ একই সময় নারীর উন্নয়ন ভাবনা ও নারীকে মানুষের মর্যাদাদানের যে লড়াই রামমোহন ও বিশেষত বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল, তাকে বেগময় করে তোলে কৌলীন্য প্রথা বা বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলন। এই বিষয়েও বিদ্যাসাগরই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই বিষয়ে পুস্তিকা লেখেন — 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। নারীর প্রতি অপার করুণাময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পুরুষের বহুবিবাহের

বিরুদ্ধে অসহায় নারীর সপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন এইভাবে, "... বহুবিবাহ প্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই, এই প্রথার প্রবলতাপ্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।" *(পৃ: ৮৪৩, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কামিনী প্রকাশনালয়, কলিকাতা, ১৩৯৯)* সেই সময়ে অনেকের রচনাতেই বিধবার দুর্দশার কথা স্থান পেয়েছিল। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের লেখনীতে বাল্যবিধবার যন্ত্রণার চিত্রটি এইভাবে ফুটে উঠেছে — "... একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলতে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। ... আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিনবার ভাত খেতেম, এখন একবার বই খেতে নাই, রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না।" *(পৃ: ১০৮-১০৯, বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৮১)* শুধু তাই নয় বিধবাবিবাহ আইন পাসের জন্য ৯৮৭ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহিত একটি আবেদন পত্র ভারত সরকারকে বিবেচনার জন্য তিনি পাঠান। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭৭-১৯০৫) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। অবশেষে ১৮৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন পাশ করা হয়, যাতে এক পত্নী বর্তমান থাকলে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ বা বেআইনি ঘোষিত হয়। এই বহুবিবাহের ফলে 'স্বামী গৃহবাস, স্বামী সহবাস, স্বামী দত্ত গ্রাসাস্বাদন কুলীন কন্যাদের স্বপ্নের অগোচর' থাকায় সেদিনের সমাজে নারীর সামাজিক মান মর্যাদা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। সেই সমাজকে বিদ্যাসাগর তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করে নারীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, "হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রফাই প্রধান কর্ম ও পরম কর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।" *(পৃ: ৮৩৯, বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কামিনী প্রকাশনালয়, কলিকাতা, ১৩৯৯)* ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে 'বাবু' সম্প্রদায়ের মদ্যাসক্তি, উপপত্নী রাখা, বাগানবাড়িতে বারবণিতা নিয়ে আমোদ করা ইত্যাদি ঘটনা সমাজে নীতিবোধের অভাব ও নারীর বিপর্যস্ত

অবস্থানকে চিহ্নিত করে। আর নারীর এই দুরবস্থার অন্যতম কারণ হল — বাল্যবিবাহ, বৈধব্যের নির্যাতন, কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদির কুফল। তাই সামাজিক এইসব আন্দোলন এবার চির অবহেলিত নারীকে নিয়ে তৎকালীন সমাজকে ভাবতে শিখিয়েছিল। পুরনো সঞ্চয়, পুরনো বিশ্বাস ভাঙ্গতে লাগল। গড়তে লাগল একটি নূতন সমাজ-জীবন — তবে এই পরিবর্তন মন্দাক্রান্তা ছন্দে ঘটেছে, ধীরে ধীরে তা প্রকাশমান হয়েছে।

যৌথ পরিবারই ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের আদর্শ। যৌথ পরিবারের যে কাঠামো সমাজ জীবনে বর্তমান ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ ঘটায় ধীরে ধীরে সেই কাঠামোতে ভাঙন ধরে যায়। এছাড়া যৌথ পরিবারে নানাজনের সঙ্গে নানা সম্পর্কের একটি সূক্ষ্ম জালিকা তৈরি হত। আর সেই পরিবারে নারীই ছিল অন্দরমহলের সমস্ত কর্মের চালিকাশক্তি। সেখানে সবই ছিল, ছিল না শুধু নারীর নিজস্ব স্থান। নীরবে সেই বহু মানুষের পরিবার বন্ধনকে মানতে বাধ্য থাকত নারী। এবার পাশ্চাত্যের পরিবর্তনের হাওয়ায় এদেশের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস তৈরি হতে লাগল, সংস্কৃতিবান পুরুষ একটু একটু সরে আসতে লাগল যৌথ পরিবার বন্ধন থেকে এবং একইসঙ্গে স্ত্রীকেও সঙ্গিনীরূপে পাশে পেতে চাইল। কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ স্থাপনের দ্বারা যে নগরায়ণ ঘটতে লাগল, তার আঘাত এসে এইভাবে লাগল একান্নবর্তী পরিবারের কাঠামোতে। এতদিনের একমাত্র কৃষিভিত্তিক পেশার পাশে জীবিকার নানা নূতন পথ উন্মুক্ত হতে লাগল। ফলে যূথবদ্ধ পারিবারিক জীবন থেকে মানুষ সরে এসে একক পরিবারের নূতন আদর্শ তৈরি করতে লাগল। যৌথ পরিবারই ছিল নারীর অবরুদ্ধ জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষিত পুরুষ এখন তার সহধর্মিণীকে শিক্ষিতা করে তুলতে আগ্রহী হলেন। নূতন নূতন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে এঁরাও এবার প্রথা ভাঙতে চাইলেন। একান্নবর্তী পরিবারের করুণ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার এক বিদ্রোহ শুরু হল। ১৮৯৮ সালের জুন মাসে মৃণালিনী দেবী রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন যে তাঁর পক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে — এর প্রমাণ মেলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড গ্রন্থটি থেকে *(পৃ: ৪৮১, বিশ্বভারতী, ১৯৭১)*। ১৩০১ বঙ্গাব্দের বামাবোধিনী পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় কুমুদিনী রায়ের 'হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে 'একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের অনেক সময়েই

ঝগড়াঝাঁটি হয় বিশেষত ননদ ও ভ্রাতৃবধূদের মধ্যে।'

নারীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, বিশেষ করে শিক্ষার ফলে স্ত্রী স্বামীর মন, ভাবাদর্শ প্রভৃতি গভীরভাবে অনুভব করতে পারবে এই বিশ্বাস থেকেই অন্তঃপুরে নারীদের মধ্যে সামান্য শিক্ষার প্রকাশ ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃহত্তর বাঙালী সমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য মিশনারীরা প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু সেই শিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করেছে বিদ্যাসাগর, বেথুন (১৮০১-১৮৫১), ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যবৃন্দ, প্রজাহিতৈষী জমিদারবৃন্দ ও অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের অবিরাম চেষ্টায়। এই বিষয়ে সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকার বিশেষ অবদানের কথা স্মরণযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা, দ্বিতীয়ার্ধে তা জোয়ারে পরিণত হয়। স্ত্রীকে জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে মানসসঙ্গিনী হিসেবে গড়ে তোলার মানসিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা দিল। এর ফলে এক নূতন মূল্যবোধ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সেদিনের বাঙালীকে সচেতন করে দিয়েছিল। কিন্তু এ কাজ সহজে হয় নি; রক্ষণশীল সমাজের প্রবল আপত্তি ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নারীর নিজস্ব প্রয়োজনের চাইতে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক ও নিজের পরিবারের বাধা। অবশেষে এই বাধার সীমা অতিক্রম করে নারীশিক্ষা ব্যপ্তিলাভ করে এবং তা একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। তবুও সেদিন যে শিক্ষা নারীকে উন্নততর স্ত্রী ও মা হতে সাহায্য করবে সেই শিক্ষার সপক্ষেই মত পোষণ করেন নিস্তারিণী দেবী (১৮৩৩-১৯১৬), কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮৩৭-?), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) প্রমুখ নারীবৃন্দ। জাগরণের এই পর্যায়ে কিন্তু নারী ভাবতে শেখেনি শিক্ষালাভ ব্যক্তিত্বের জাগরণের সহায়ক। তবুও শিক্ষা-কর্মে-মানসিকতায় এক আধুনিক নারী সমাজের রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। "শতাব্দীর শেষ দু'দশকে চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কুমুদিনী দাস, সরলা ঘোষাল প্রমুখ কতিপয় মহিলা চাকুরি গ্রহণ করলেও সেকালের মহিলারা মনে করতেন না যে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।" *(পৃ: ৫০, গোলাম মুরশিদ, নারী প্রগতি ঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, ২০০১)।*

অবরোধ প্রথা যৌথ পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। রাসসুন্দরী দেবী

(১৮০৯-১৯০০) তাঁর 'আমার জীবন' (১৮৭৬) নামক আত্মচরিতে নারীর অবরুদ্ধ জীবনের কথা প্রথম বলেছিলেন। নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী (১৮৭৮-১৯০৬) 'অবরোধে হীনাবস্থা' প্রবন্ধে ১৩০১ বঙ্গাব্দের বামাবোধিনীর বৈশাখ সংখ্যায় লিখেছিলেন, "এই অবরোধ প্রথাই আমাদের সর্বনাশের মূল, এই অবরোধ প্রথাই আমাদের হীনাবস্থার কারণ" — *(তথ্য ঋণ : পৃ: ২৬৯, স্বপন বসু, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্র', পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৭২)* সেই সময়কার অবরুদ্ধ নারী জীবনের অন্তঃপুরের একটি চিত্র পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) রচনাতে — "মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজা বন্ধ পালকির হাঁপ ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা, রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না।... ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়ো মানুষের ঝি-বউদের পালকির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের।" *(পৃ: ৭১১, ছেলেবেলা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯১৩ শক।)* একইভাবে অবরোধ প্রথার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বেগম রোকেয়ার রচনাতেও পাওয়া যায়। কলকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবিদের রেলপথে যাত্রার আগে পালকিগুলিকে "(১) বনাতের পর্দা দ্বারা প্যাক করে; (২) তাহার উপর মোম জমা কাপড় দ্বারা সেলাই করে; (৩) তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে; (৪) তাহার পর বোম্বাই চাদরের দ্বারা সেলাই করে; (৫) অতঃপর সর্বোপরি চট মোড়াই করিয়া সেলাই করে" — *(পৃ: ৩১৯, অবরোধবাসিনী ২৪ সংখ্যক চিত্র, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৬)* ঢাকা দেওয়া হত।

কন্যা সন্তানকে পরিবারের বোঝা স্বরূপ ভাবা হত। নারী জন্ম ছিল অভিশপ্ত — এমন ধারণা সমাজে বদ্ধমূল ছিল। কন্যা প্রসব করা অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হত বলেই গর্ভধারিণীকেও তার জন্য দণ্ড পেতে হত। শতাব্দীর শেষ সময়েও এই ধারণা যে বজায় ছিল তার নিদর্শন শরৎকুমারী চৌধুরানীর (১৮৬১-১৯২০) রচনায়, যেখানে নারী জন্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন — "... অভাগীর যেমন অদৃষ্ট, দশ মাস গর্ভে ধরে কিনা একটা মাটির ঢেলা হল।" *(পৃ: ১৫৪, শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)* অনেক

আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারী প্রগতি ভাবনার বিকাশ হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও নারীকে বা স্ত্রীকে 'সর্ব্বগুণান্বিতা দাসীরূপে' যে দেখা হত তার নিদর্শন মেলে ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে যেখানে কুমুদিনী তার স্বামীকে প্রশ্ন করেছিল — 'স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন জাতের লোক?' কিন্তু এই পরিমন্ডলেই কিছু কিছু আধুনিক মনস্ক পুরুষ ছিলেন, যাঁরা নারীকে তার যোগ্য সম্মান দিতে দ্বিধা করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) ছিলেন তেমনি ব্যতিক্রমী এক ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রবাসকালে তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে 'ভাই' সম্বোধন করে চিঠি লেখেন — "তুমি এখন না জানি কত বড় হইয়াছ। এখন তোমার শরীরের স্ফূর্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইবার সময়। ... তুমি এখন আপনিই আপনার রক্ষয়িত্রী এবং তোমার আপনার মনের বলের উপর সুখ-দুঃখ নির্ভর করিবে।" *(পৃ: ৪৬-৪৮, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত পুরাতনী, কলকাতা, ১৮৭৯ শক)* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে গড়ের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। স্ত্রীকে একটু একটু করে তার অধিকার দেবার যে প্রয়াস সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তাই হল ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন চেতনার প্রতিফলক।

ধীরে ধীরে সমাজে বাল্যবিবাহ কমতে লাগল, বিবাহের বয়স সীমা বাড়তে লাগল, এমনকি, স্বেচ্ছা বিবাহও দেখা দিতে শুরু করল। ১৮৯৯ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে ইন্দিরাদেবীর (১৮৭৩-১৯৬০) বিবাহ হয় প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) সঙ্গে। ব্রাহ্মনেতা চণ্ডীচরণ সেনের (১৮৪৫-১৯০৬) জ্যেষ্ঠা কন্যা কামিনীর বিবাহ হয় ৩০ বছর বয়সে। চিকিৎসাবিদ কনিষ্ঠা কন্যা যামিনী সেন অবিবাহিতা ছিলেন। আবার সরলা দেবীর (১৮৭২-১৯৩৯) প্রথমে লোকেন পালিত এবং তারপর মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হলেও তিনি এদের কাউকেই বিবাহ করেন নি। এ তথ্য জানা যায় সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' আত্মজীবনী থেকে। কেশব চন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৯৪) দুই মেয়ে সুনীতি এবং সুচারুরও বিবাহ হয় পূর্ব পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে। এঁরা কেউই ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করেন নি, যা সেদিনের সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এই বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে গিয়েছিল। কমলা দত্তের সঙ্গে প্রমথনাথ বসুর বিবাহও প্রণয়ঘটিত। *(পৃ: ৭১, চিত্রা দেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স,*

১৯৮৪) এই স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হন মূলত ব্রাহ্ম পরিবারের নারীরা। তাই ১৮৯৩ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৮৬০-১৯৪৩) 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কবিতায় নারী জন্ম সম্পর্কে যে আক্ষেপ করেছেন তার মধ্যে আপামর নারীর বেদনা রূপলাভ করেছে—

"জীবনের মত সবি নীরবে নীরবে হবে,
মরণের গায়ে মোর নীরবতা মাখা রবে।"

তখন উপলব্ধি করা যায়, সমাজ নারীর ব্যথা না বোঝায় কবির মনে এত অভিমান জমে রয়েছে।

এই শতাব্দীতে অনেক ঘাত প্রতিঘাত সমাজের ওপর আছড়ে পড়েছে। নূতন ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছে। সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে যে দৈনন্দিন জীবন মেয়েদের, সেই জীবন নানা বিধিনিষেধে বাধা ছিল। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যাহিকতার সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেই নারী তার নিজস্ব ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রস্তুতি নিয়েছে এই সময়কালে। সমাজ নারীর মর্যাদা ও অধিকারবোধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শিখেছে। এর সঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে; তা হল 'মেয়ে মানুষ' বা 'মেয়ে ছেলে' থেকে নারীর 'ভদ্রমহিলায়' উত্তরণ। 'ভদ্রমহিলা'র সংজ্ঞা ছিল অনেকটা এইরকম — "Bhadramahila was originally ... used to describe the female members of bhadrolok families, but it crystallized into the term for an ideal type, embodying a specific set of qualities and denoting a certain lifestyle." *(P. 54, Meredith Borthwick, 'The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905 Princeton N. J., 1884.)*

এবার নারীর নামের শেষে 'দেবী', 'দাসী' লেখার প্রাচীন রীতি ত্যাগ করে পদবী লেখার চলন হল। মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন এল, পায়ে জুতো পরার চলন হল, পর্দা বা ঘোমটার আগল উঠে যেতে লাগল। ১৮৬৬ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জাহাজ ঘাট থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যান গাড়িতে করে। এমনকি গভর্নর জেনারেলের ভোজসভার নিমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর না যেতে পারায় স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে সেখানে তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। ১৮৬৯ সালে কলকাতার দত্ত পরিবারের গোবিন্দচন্দ্র

দত্ত তাঁর দুই কন্যা তরু ও অরু দত্তকে বিদেশে পাঠান। ১৮৭১ সালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা সভায় স্ত্রীরা স্বামীদের পাশে আসন গ্রহণের অনুমতি পেল। ১৮৭৮ সালে মনোরমা মজুমদার (গিরীন্দ্র চন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী) প্রার্থনা সভা পরিচালনা করেছিলেন। ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ তাঁর বালিকা বধূটিকে শিক্ষিতা করে তোলার জন্য কলকাতার লরেটো স্কুলে পড়তে পাঠান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যান ও পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী একাই বিলেত পাড়ি দেন। এটি সে যুগের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে একটি দুঃসাহসিক দৃষ্টান্ত বলা যায়। অর্থাৎ নারী স্ত্রীর সমানাধিকার না পেলেও সেদিনের কিছু পুরুষ অন্ততঃ স্ত্রীকে সহধর্মিনীর যোগ্য মর্যাদা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে নারীর প্রগতি বা আধুনিকীকরণের যাত্রা শুরু হয়। চার দেওয়ালে ঘেরা অন্তঃপুরের খাঁচা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। গর্বহীন, দীপ্তিহীন, ম্লান, মূক নারী মুখগুলো একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করে এই শতাব্দীতেই। সমাজে নারী ভাবনায় অনেকটা সচেতনতা, সংবেদনশীলতা ও মানবিকতার বিকাশ এই শতকেই হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে ধীরে ধীরে শিক্ষায়, সাহিত্য-চর্চায়, সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নিমজ্জমান মুসলিম সম্প্রদায় হতাশা, বঞ্চনা ও ধ্বংসের পথ থেকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিভাবে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল সেই ইতিহাস জানার প্রয়োজন আছে।

মুসলিম সমাজের চিত্রটি ছিল অনেকটাই আলাদা। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজে নেতৃত্ব দানের মত কেউ ছিল না। বৃটিশ শাসননীতির ফলে অনেক বড় বড় বনেদি পরিবার ও ভূস্বামী ধ্বংস হয়ে যায়। আর্থিক কারণে সাধারণ মানুষ না শিক্ষালাভ করতে পেরেছে, না ব্যবসা বৃত্তিতে অংশ নিতে পেরেছে। তার ফলে হিন্দু সমাজের মত 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণী মুসলিম সমাজে গড়ে ওঠেনি। ১৮৬৩ সালে আব্দুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) সহায়তায় 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' এবং ১৮৭৮ সালে সৈয়দ আমীর আলির (১৮৪৯-১৯২৮) উদ্যোগে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এস্যোসিয়েশন' স্থাপনের মাধ্যমে 'নিউ এলিট' বা নব্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস লক্ষিত হয়। পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য স্কুল, মাদ্রাসা স্থাপন, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা, সভা সমিতি গঠন

হতে লাগল এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা দিল।

তখন মুসলিম সমাজে আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণী ও 'আতরফ' বা অনভিজাত এবং 'আজলাফ' বা ইতর শ্রেণী যারা ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় মুসলমান এই তিন শ্রেণী নিয়ে শ্রেণীভেদ প্রথা প্রবল ছিল। হিন্দু সমাজের নানা কু-প্রথা মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। জাতপাতের মত বিষয় মুসলিম সমাজে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সে সময়কার পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়— "পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের অংশবিশেষে শরীফতের দাবীদাওয়াটা খুব বেশি। ... উত্তরবঙ্গে 'বাদিয়া', 'নিকারী' ও আসামে 'মাটীয়া' উপাধি বিশিষ্ট মোসলমানগণ একসঙ্গে অন্য মোসলমানের সহিত আহার করা দূরে থাকুক এক মসজিদে এক ঈদগাহ্ বা মাঠে নমাজ পড়িতে পারে না।" *(মনিরুজুমান ইসলামবাদী, 'সমাজ সংস্কার প্রবন্ধ', আল-ইসলাম, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬; তথ্য ঋণ : পৃ: ৪০০, ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩)* ইসলাম ধর্মে মানুষের সমমর্যাদার কথা বলা হলেও সেদিনের সমাজে এই শ্রেণীভেদ প্রথাকে 'সমাজের কালিমা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রেণীভেদ প্রথা ছাড়া পাঁচশালা-দশশালা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি রাজস্ব নীতির প্রভাবে আর্থিক দিক থেকে মুসলমান সমাজ যে হতদরিদ্র হয়ে পড়েছিল, তার প্রভাব পড়েছিল সমাজ-জীবনে।

পর্দাপ্রথা ও অবরোধ সমাজে নারীর উন্নতি ও নারীমুক্তির অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীর বিরোধ ছিলই। ১৯০৩ সালে দিল্লিতে 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে' খোজা সম্প্রদায়ের নেতা সুলতান মহম্মদ আগা খান পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করেছিলেন, তখন ইসলাম প্রচারকে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল। "হজরত মোহম্মদের সময়ে, ইসলামানুমোদিত যেরূপ সরল ও তাঁহার উদারভাবের অবরোধ প্রথা (হেজাবের) প্রচলন ছিল, বর্তমান যুগে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন ধরনের পর্দার যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এক্ষণে ধর্ম ও নীতিবিবর্জিত নাস্তিক ভাবের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় সমাজবন্ধনও ক্রমান্বয়ে শিথিল হইয়া যাইতেছে।" *(মোহম্মদ করিম চাঁদ, প্রবন্ধ 'হেজাবন্নেসা বা মোসলেম রমণীর পর্দা', ইসলাম প্রচারক, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩১৪; তথ্যঋণ : পৃ: ৪০৩, ওয়াকিল*

আহমেদ, ঐ) এই মতকে কেউ কেউ সমর্থন করেছিলেন "... সকল দেখিয়া শুনিয়া সকল বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা ভারতীয় মুসলমানদিগের বর্তমান অবরোধ প্রথার সমর্থন করিতেছি।" *(পত্রিকা সম্পাদক, রেয়াজুদ্দীন আহমেদ, ইসলাম প্রচারক, ৮ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৩১৪; তথ্যঋণ: পৃ: ৪০৩, ওয়াকিল আহমেদ, ঐ)* সমাজ পরিবর্তন তো নয়ই, বরং সমাজবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সেই সময় খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৯-১৯১৭) তাঁর 'The origin of the Mussalman of Bengal' (১৮৯৫), আলাউদ্দীন আহমদ (১৮৫১-১৯১৫), মহম্মদ মেহেরুল্লা (১৮৬১-১৯০৭) তাঁর 'বাল্যবিবাহের বিষময় ফল', মহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদ (১৮৬২-১৯৩৩), এ. আল মুসভী, করমচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব পর্দাপ্রথা ও অবরোধের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। শেখ জমিরুদ্দিনের (১৮৭০-১৯৩০) 'ইসলাম প্রচারকে' প্রকাশিত 'মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' ইত্যাদি রচনাতে মুসলমান সমাজের অবস্থান ও সমাজে নারীর অবনমন সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছিল।

বহুবিবাহ ও তালাকপ্রথা, বাঁদীপ্রথা মুসলিম সমাজের সমস্যা — যা নিতান্তই নারীকেন্দ্রিক। তেমন কোন মহান হৃদয় সমাজ-সংস্কারক মুসলিম সমাজে আবির্ভূত হন নি, যারা নারীর সমস্যাকে হৃদয়ঙ্গম করে তার সমাধানের জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ হিন্দু সংস্কার থেকে মুসলিম সমাজে এসেছে। এগুলি তাই কৃত্রিম সমস্যা যা সমাজে কালো ছায়া ফেলেছিল। ইসলামের আদর্শ অনুসারে বিধবা বিবাহ একটি গুরুতর কর্তব্য। কিন্তু হিন্দু সমাজের মত বিধবার বিবাহ মুসলিম সমাজে প্রায় অপ্রচলিত ছিল। ফলে বৈধব্যের যন্ত্রণা সেই সমাজের নারীদের সহ্য করতে হয়। বহু বিবাহের কথা ইসলাম ধর্ম সমর্থিত। কিন্তু তার সঙ্গে এই বিধানও দেওয়া আছে যে — সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা এবং কথোপকথনকালে সকলের সঙ্গে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত। আবার বিবাহ বিচ্ছেদের কথা যা 'তালাকপ্রথা' নামে পরিচিত তার বিধানও ইসলাম ধর্ম সমর্থিত। বন্ধ্যাত্ব, সৌন্দর্যহীনতা, চরিত্রহীনতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, উন্মাদগ্রস্ততা বা অন্য কারণে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য ঘটলেও বিবাহ বিচ্ছেদের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে বলে ইসলাম ধর্মে বলা আছে। এই বহুবিবাহ, তালাকপ্রথার সূত্র ধরেই এসেছে বাঁদীপ্রথা। একজন স্ত্রীকে বিবির মর্যাদা দান, অন্যদের বাঁদী করে রাখা মুসলিম

সমাজে নারী ভাবনার অবনমন ঘটিয়েছে। সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ধর্ম। তাই ধর্মের নামে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বহুবিবাহ ও পক্ষান্তরে বাঁদী প্রথাকেই পোষণ করে গিয়েছে। এই বিষয়ে তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় যে রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় তার অন্যতম নমুনা 'নবনূর' (১৯০৩) পত্রিকায় মেলে। "আমাদের সমাজে যে বাঁদী প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা একমাত্র তাঁহাদেরই সৃষ্টি এবং যে বহু বিবাহের অযথা প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও তাঁহাদের স্বার্থসমুদ্ভূত।" (*পৃ: ৩৪২, কাজী ইমদাদুল হক, বহুবিবাহ (প্রবন্ধ), নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১২; তথ্য ঋণ : পৃ: ৪১১, ওয়াকিল আহমেদ, ঐ)*। এই জাতীয় অনেক প্রবন্ধ সে সময় প্রকাশিত হয়।

কলকাতায় হরিমোহন ফুলমণির অপরিণত বয়সে বিবাহের ফলে স্বামী সহবাসের পর ফুলমণির মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটিকে মূলতঃ কেন্দ্র করে 'এজ অব কনসেন্ট এ্যাক্ট' বা 'সহবাস সম্মতি আইন' ১৮৯১ সালে পাশ হয়। এতে বিবাহের বয়স ১২ বছর করার কথা বলা হয়। কিন্তু এই সহবাস আইন নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া না হলেও মুসলিম সমাজে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। নারীকে পর্দানসীন রাখা, তাকে মানুষ না ভেবে পশুর মত অত্যাচার করা, মান মর্যাদাহীন অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করার মধ্যে সেদিনের মুসলিম সমাজে নারী ভাবনায় অবনতিই প্রকাশ পেয়েছে। মীর মোশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'আমার জীবনী' (১৯০৮) গ্রন্থে তাঁর পরিবারে ৩২ জন দাসী-বাঁদীর উল্লেখ করেছেন, যাদের রংপুর থেকে ক্রয় করে আনা হয়েছিল। দাসী-বাঁদী ক্রয় করে এনে বাড়িতে গৃহস্বামী তাদের উপপত্নী করে রাখতেন। সুতরাং যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজের নারী মুক্তির আলো দেখতে শুরু করেছিল, মুসলিম সমাজের চিত্রটি ঠিক তার বিপরীত। পুরুষতান্ত্রিকতার অভিশাপ নারীজীবনকে বিপর্যস্ত, বিপন্ন, নিরাপত্তাহীনতায় ভরিয়ে তুলেছিল।

আর যে সমস্যাটি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল তা হল — কন্যা সন্তানের অনাদর এবং গর্ভধারিণীর বিড়ম্বনা। কন্যা প্রসব করা এমন অমার্জনীয় অপরাধ ছিল যে তার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও ছিল — বৃষকে স্বর্ণালংকারে ভূষিত করা, ব্রাহ্মণভোজন, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি। পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলেই নারী কন্যা সন্তান প্রসব করেছে বলে সেদিনের সমাজ বিশ্বাস করত। বিবাহের উদ্দেশ্যেই ছিল বংশ রক্ষা; কন্যা

সন্তান প্রসব সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবে বলে গর্ভধারিণীর ওপর নানাপ্রকার নির্যাতন সেদিনের সমাজ অবিচারে চালিয়ে গিয়েছে। আর এই ভাবনার মূলসূত্রটি হল লিঙ্গ বৈষম্য। নারীর তুলনায় পুরুষকে অনেক বেশি ক্ষমতাবান করে সমাজ সৃষ্টি করেছে, সেই কারণেই নারীকে অন্দরমহলের চৌহদ্দিতে বন্দী রাখার কৌশল রচিত হয়েছে, তাকে পরিবারে প্রান্তিক করে রাখা হয়েছে। মানব জন্মের পিছনে বিজ্ঞান ভিত্তিক কারণটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনা পুরুষ-নারীর লিঙ্গ বৈষম্য। তা সত্ত্বেও রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করেও বেশ কিছু নারী নারীমুক্তির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে চলেছিলেন সে যুগের মুসলিম সমাজেও। এঁরা হলেন ফুলবাহার বিবি (১৯১৬-?), দৌলৎউন্নিসা খাতুন (১৯১৮-?), আজিজুন্নেসা খাতুন, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩), করিমুন্নেসা খাতুন (১৮৫৫-১৯২৬), রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), নুরুন্নেসা খাতুন (১৮৯২-১৯৭৫), সারা তাইফোর (১৮৯৩-১৯৭১) ইত্যাদি মহীয়সী নারীরা। আঙ্গুলে গোনা যায় এমন দু'চারজন মুসলিম নারী সেদিন নারীর শিক্ষা, পর্দাপ্রথা ও অবরোধের বিরোধিতা করে মুসলিম নারী সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেনের 'আঞ্জুমানে-খাওয়াতীনে-ইসলাম' অন্যতম, যেখানে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বস্তিবাসীদের জন্য শিক্ষা সহ অন্যান্য শিক্ষাকর্মে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। 'নারীতীর্থ' আশ্রম স্থাপিত হয় কলকাতায় ১৯২২ সালে, প্রতিষ্ঠাতা ডঃ লুৎফার রহমান (১৮৮৯-১৯২৯)। 'Anti Purdah League' গঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) পক্ষ থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সমাজের অচলায়তনের বাঁধন ভেঙে বাঙালী মুসলিম নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন 'আধুনিক নারী' চেতনা ও ভাবনার ঊষাকালের উদয় হয়। তারই মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মননশীল ভাবনার লেখক সাহিত্যিকেরা সেদিনের সমাজের অধঃপতনের, দুর্গতির কারণগুলিকে চিহ্নিতকরণ করেছিলেন। আর বেগম রোকেয়া অবরোধপ্রথা ও শিক্ষাহীনতার যন্ত্রণা জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর কর্মধারার অভিমুখই ছিল নারীর শিক্ষা ও নারীর উন্নয়ন।

আমরা জানি, ১৭৫৭ সালে ইংরেজের হাতে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও ইংরেজের

ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শতাব্দী-ব্যাপী মোঘল শাসনের অবসানই শুধু হয় নি, সেইসঙ্গে ভারতবাসীর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়। সেই পরিবর্তন ধীরে ধীরে নানাভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক পালা পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা বৃটিশ রাজতন্ত্রের শাসন থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম ১৯৪৭ সালে। সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটটিকে দেখে নেওয়া যাক্।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম ফল ভারতবর্ষে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনের পরিসমাপ্তি এবং ১৮৫৮ সালে পার্লামেন্টে ভারতশাসন আইন গৃহীত হয়। ১লা নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়া তাঁর বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে ভারতবর্ষের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এই ঘোষণাপত্রে পরাধীন ভারতবাসীর অধিকার সম্পর্কে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকলেও তা কার্যকর করা হয় নি। ভারতবর্ষের সেচ ব্যবস্থার অভাব ও বার বার দুর্ভিক্ষ — অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ছিল। তার চাইতেও অধিক দায়ী বৃটিশ আর্থিক নীতির দুর্বলতা। তার অনিবার্য প্রভাব গ্রামীণ মানুষদের সর্বনিম্ন-ক্রয়ক্ষমতার অভাব।

এই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন কোন একক গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা সম্ভব নয় — তাই ১৮৩৮ সালে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের (১৮৭৩-১৮৬৭) সভাপতিত্বে জমিদার সমিতি থেকে ১৮৫১ সালের 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯১৯) ১৮৭৬ সালের 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনের পালাবদল শুরু হয়ে যায়। নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৯১৪), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৫) 'ভারত সভা'য় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মপ্রণালী পেশ করেন।

১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের পর বাংলার সামাজিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে নানা ধ্যান-ধারণা, মতৈক্য-মতানৈক্য, সাহিত্য-সৃজন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় চর্চিত হতে লাগল নানাপ্রকার সংবাদপত্র ও সংবাদ সাময়িকীগুলিতে। গণমাধ্যম বলতে সেই যুগে সংবাদ সাময়িক পত্রগুলিকেই বোঝায়। ভাবনার ঐক্য চেতনা,

সাংস্কৃতিক সাজুয্যবোধ, দেশ-বিদেশের নানা ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচয় এবং সর্বোপরি একটি জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রগুলির অবদান অপরিসীম। বৃটিশের দমননীতির ফলে ১৮৭৮ সালে 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রণীত হয়। পরবর্তীকালে ১৯০৮ সালে 'নিউজ পেপার অ্যাক্ট' ও ১৯১০ সালে 'ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট' প্রণীত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও জোরালো হয়ে উঠতে লাগল।

মহারানীর শাসনকালের প্রথমেই ভারতবর্ষের আমদানি অনুযায়ী অপরিমিত অর্থ বিদেশে চলে যেতে থাকে। এর প্রভাব এসে পড়ে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর। এই ব্যবসাগুলির উন্নতি সাধনের জন্য অসম্ভব নির্যাতন সহ্য করতে হয় কৃষক সম্প্রদায়কে। ১৮৬০ সালের 'নীলবিদ্রোহ' — যার মূল কারণ কৃষকদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। এই বিদ্রোহই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বৃটিশ শাসনের অন্ধ মোহজাল ছিন্ন করে জাতীয় আন্দোলনের আঙিনায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ এই নীলবিদ্রোহকে 'বঙ্গদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালের প্রথম বিপ্লব' বলে বর্ণনা করেছেন। নীলবিদ্রোহের পর ১৮৭৩ সালে পাবনা-সিরাজগঞ্জে প্রজা বিদ্রোহ হয়।

১৮৭০ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্যে এক ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন 'খেরওয়ার' আন্দোলন নামে পরিচিত। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী উচ্চ বর্ণজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। ১৮৭৪-১৮৮২ পর্যন্ত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে একটি গূঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি প্রতিবাদী রাজনৈতিক মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এই আন্দোলনের মধ্যে। ১৮৭৪ সালের পর সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়। ভগীরথ মাঝি ও পরবর্তীকালে জ্ঞান মাঝির নেতৃত্বে ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আন্দোলন চলে যার মধ্যে সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠার তীব্র আকুলতা সৃষ্টি হল।

১৮৬০ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত চলে মুণ্ডা বিদ্রোহ। নানা পথ পরিবর্তন করে এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত মুণ্ডা নেতা বীরসা মুণ্ডার (১৮৭৪-১৯০২) নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল এবং তিনিই প্রথম স্বাধীন মুণ্ডা রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই বিষয়ে ভারতীয় ইতিহাস

কংগ্রেসের ১৯৭৯ সালের অধিবেশনে আধুনিক ভারত শাখার সভাপতি শ্রী বিনয়ভূষণ চৌধুরীর ভাষণে জানা যায়, "A far larger vision animated every action of his : the creation of a powerful independent Munda Raj, and the moral and spiritual regeneration of the Mundas as a preparation for that."

এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতবাসী বৃটিশের দমন পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করে। এই অবস্থায় আবার নূতন করে ঝড় তুলল 'ইলবার্ট বিল' (১৮৮৩) — যেখানে শ্বেতাঙ্গদের বিচার ভারতীয়রা করতে পারবে বলে বিল আনেন লর্ড রিপন। পরে বৃটিশরা নিজেরাই এই বিলের বিরোধিতা করলে লর্ড রিপন সেই বিলটিকে ইউরোপীয়দের মনোমত করে পাশ করাতে বাধ্য হন। এই সংগঠিত আন্দোলন অবশেষে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্যে এক সংহত রূপ লাভ করে। উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৪-১৯০৬) সভাপতিত্বে বোম্বাই-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হল। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন, ১৯১৪-১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ — সব মিলিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুটি দলে বিভাজন — এই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলই ছিল বৃটিশের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ও ভারতবর্ষের মুক্তি। এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলন বহুধারায় ব্যাপ্ত হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। তদুপরি ১৮৯৪ সালে শুল্ক সংক্রান্ত আইন ও ১৮৯৬ সালে কার্পাস বস্ত্র বিষয়ক আইন বৃটিশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও একই সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংকটকে ঘনিয়ে তোলে। গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। তদুপরি বার বার দুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষের প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু বৃটিশ শোষণ নীতিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

মুণ্ডা বিদ্রোহের পর ১৯১৪ সাল থেকে শুরু হয় ওঁরাও উপজাতি বিদ্রোহ। জমিদারের কাছ থেকে জমি দখল তাদের আন্দোলনের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এটিও ছিল একটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানা জায়গায় যে কৃষক বিদ্রোহগুলি হয়েছিল তাকে কংগ্রেসের কৃষক নেতারা জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে বৃহৎ এক জনআন্দোলনে তাৎপর্যমণ্ডিত করে

তুলতে পারেন নি। ব্যতিক্রম ছিলেন লোকমান্য তিলক (১৮৬৪-১৯২০) — যিনি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনকে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯১৭ সালে চম্পারণ বিদ্রোহ ও ১৯১৮ সালে গুজরাটের কৃষক আন্দোলন-এর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীও (১৮৬৯-১৯৪৮) যুক্ত হলেন এবং ধীরে ধীরে এই কৃষক বিদ্রোহ ও অন্যান্য আন্দোলনগুলি ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হল। পরে ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে।

কৃষক বিদ্রোহগুলির সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক কাজের সময়সীমা হ্রাস, বেতন বৃদ্ধি ও ইউরোপীয়দের বর্ণ বিদ্বেষমূলক অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯৪৫), প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী (১৮৭৮-১৯২১) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

মুসলিম সমাজ জীবনেও এই সময় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে ভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়। এর আগে আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ও তার সহযোগীরা মিলে প্রথমে 'মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫৫) ও পরে 'মহামেডান লিটারারী সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীকে ও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন। আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। সিভিল সার্ভিসের মত উচ্চ সরকারি পদে 'মনোনয়ন প্রথা'র দাবি করেন সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৯৭ সালে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার একটি সারকুলার জারি করে, — "If there be two candidates for one appointment, each of them possessing the requisite qualifications, preference should be given to the Muhammedan candidate." *Government Circular No. 588 42 T. G. Darjeeling, 15th September, 1897. The Moslem Chronicle, 16th July, 1898.* [*তথ্যঋণ : পৃ: ৫২৪, ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯১৭ (প্রথম পুনর্মুদ্রণ)*]

এই সারকুলারটি জারী হবার পর থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তিক্ততা শুরু হয়।

এই সময়ে মুসলমান সম্প্রদায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে বৃটিশের চক্ষুঃশূল হতে চান নি। কারণ অশিক্ষা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে হলে কংগ্রেস নয় — বৃটিশের সঙ্গে থাকাই তাঁরা সমীচীন বলে মনে করেন। ১৮৮৮ সালে সৈয়দ আমীর আলি আলিগড়ে 'পেট্রিয়াটিক এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ঢাকার খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের সভাপতিত্বে একটি 'কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন কমিটি' গঠিত হয়। সেই সময়কালের মিহির সুধাকর (১৮৯০), ইসলাম প্রচারক (১৮৯১), কোহিনূর (১৮৯৮), নবনূর (১৯০৩) ইত্যাদি মুসলিম পত্র-পত্রিকা সৈয়দ আমীর আলির সঙ্গে সহমত পোষণ করে। ফলে স্ব-সমাজ সম্পর্কে এই নববোধ মুসলিম জাতীয়তাবাদের সূচনা করে। একদিকে উগ্র হিন্দুয়ানীর প্রভাব অন্যদিকে সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতীয় চেতনা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ভেদরেখা এঁকে দেয়। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার সিংহভাগই হিন্দু। ১৯০১ সালের জনগণনায় দেখা যায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৫.০৫ ভাগ হিন্দু, আর ২৪.০৩ ভাগ হল মুসলিম সম্প্রদায়, অন্যান্য ১০.০২। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসনের অবসান তাদের সম্মানে আঘাত হানে। বিশেষ করে রাজভাষা আরবী, ফারসীর স্থান যখন ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করে — তখন ভাষার মর্যাদা হারানোর অভিমান তারা সহজে মেনে নিতে পারে নি। সেই অভিমানী মুসলিম সমাজ ইংরেজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, প্রচারিত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের বিরত রেখেছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের কাছে কুটিরশিল্পের বিনাশ মুসলমান সম্প্রদায়কে বিশেষত শ্রমজীবী মুসলিমদের অর্থনৈতিক দুর্দশার কবলে ফেলেছে। এইসব ঘটনা মুসলিম সমাজকে বৃটিশ বিরোধী করে তুলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দুটি বিপরীত ধারার সমাবেশ দেখা যায় — একটি হল পুনরুজ্জীবনবাদী, অন্যটি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও শাসনের সঙ্গে সহাবস্থানমূলক। শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে ইসলামীয় জেহাদ তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল প্রথমদিকের আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ার্ধে এসে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন নূতন মাত্রা পেল। তখন থেকে বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তে পাওয়া গেল এক আপোষমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাব-জাত সাহিত্য-সংস্কৃতি, সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তা শিক্ষিত মুসলমানের চেতনায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুরা স্বদেশ প্রীতি ও স্বধর্ম প্রীতিকে এক ও অভিন্ন করে দেখেছেন। বিপরীত প্রক্রিয়ায় মুসলমানেরা স্বদেশ প্রীতি ও স্বধর্ম প্রীতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্তের সামাজিক অবস্থান অভিন্ন হলেও শ্রেণী চরিত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে তারা রাজনৈতিকভাবে মিলতে পারেন নি। বরং স্বার্থরক্ষা ও সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব পোষণ করেছে। তার ফলে ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের ভেদনীতির শিকার হয়ে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর বিবদমান দুই শিবিরে পরিণত হয়েছে।

আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফের ১৬ তারাতলা লেনের বাড়িতে ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির' আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ছোটলাট স্যার সিসিল বিডন, সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াজিহ্, সহ সভাপতি ছিলেন — কাজী আব্দুল বারি ও হাফিজ আজিজ আহমদ, সম্পাদক আব্দুল লতিফ। এর পনের বছর পর স্থাপিত হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮)। পাটনার নবাব আমীর আলী ছিলেন সভাপতি, সৈয়দ আমীর হোসেন সহ সভাপতি। মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমেদ খাঁ প্রথমে ট্রানশ্লেসন সোসাইটি স্থাপন করেন ১৮৬৪ সালে। এই সমিতিই পরে 'Scientific Society of Aligarh' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের জন্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল আলিগড়ে 'মোহমেডান আংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন ১৮৭৭ সালে। এটি পরে 'আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়' রূপে পরিচিতি লাভ করে।

রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী ছিল। সৈয়দ আহমেদ ১৮৮৬ সালে 'মোহমেডান এডুকেশন্যাল কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৮ সালে 'ইউনাইটেড পেট্রিয়াটিক এ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। ১৮৯৩ সালে স্থাপিত হল সৈয়দ আহমেদের 'মোহমেডান আংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন'।

এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য গুলিকে চিহ্নিত করা যায় এইভাবে — ১) মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা, ২) ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য বিভিন্ন সরকারি ব্যবস্থাকে সমর্থন জানানো, ৩) জনগণের মধ্যে আনুগত্যের মনোভাব পরিপুষ্ট করা, ৪) মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবণতা বিনষ্ট করা। এই এ্যাসোসিয়েশন থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় কংগ্রেস থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়। শুধু তাই নয় হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি তাদের স্বার্থ ও স্বতন্ত্র এই দ্বিজাতি তত্ত্বের (Two nation theory) ভাবনা প্রথম প্রকাশিত হয় এই সভা বা এ্যাসোসিয়েশন থেকেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে 'প্যান-ইসলামিজম' বা বিশ্ব মুসলিমবাদের জন্ম হয়। এই আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন আফগানিস্থানের সৈয়দ জালালউদ্দীন (১৮৩৯-১৮৯৭)। 'এক আল্লাহ্, এক রসুল, এক কোরানে'র বাণী প্রচার করে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করে তিনি মুসলমানদের একতা ও সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় মুসলিমদের বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যবোধের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি এবং সৈয়দ আহমদের ইংরেজ প্রীতিকে ধিক্কার জানান। সৈয়দ আহমেদ স্বদেশপ্রেমিক হলেও কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন বলেই সৈয়দ জালালউদ্দীনের সঙ্গে তার মতপার্থক্য থেকে যায়। হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, তার সঙ্গে সমস্ত উচ্চপদে হিন্দুদের অধিষ্ঠান, হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন — সমস্ত কিছু মিলে মুসলমান জাতি যখন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে অপারগ; আত্মগ্লানির বেদনাময় সেই সময় সৈয়দ আহমদের 'আলিগড় আন্দোলন' একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ আন্দোলনে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিম একই বৃন্তের এই দুটি কুসুমকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার ইংরেজ ষড়যন্ত্রকে সহায়তা করে এই আলিগড় আন্দোলন। তাই প্যান-ইসলামিজম বা বিশ্ব মুসলিমবাদের প্রবক্তা জালালউদ্দীনের সঙ্গে মতবিরোধ ছিল আলিগড় আন্দোলনের সৈয়দ আহমেদের।

এই সুযোগ গ্রহণ করে সুবিধাবাদী বৃটিশ শক্তি। তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মন বুঝে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নীতি গ্রহণ করে। তার ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে মুসলিম প্রতিনিধির উপস্থিতি সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। কংগ্রেসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিদের আনুপাতিক

সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২.০৭, ৭.০৬, ১০.০০ এবং ১৭.০৭।

একদিকে যেমন বিশ্ব মুসলিমবাদের জাগরণ, অন্যদিকে বাল গঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে শিবাজী উৎসব (১৮৯৫) ও স্বদেশী শিল্পমেলা ভারতীয়দের স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী করে তোলে। শিবাজী উৎসব থেকে মুসলমান সম্প্রদায় দূরত্ব বজায় রেখেছিল, ফলে স্বদেশী, স্বভাষী ও সমসংস্কৃতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে বিভেদের পাঁচিল তৈরি হয়েছিল। আবার কংগ্রেসের আন্দোলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীর বিভেদও তুঙ্গে উঠেছিল এই সময়কালেই।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এই দ্বিধাবিভক্ত রূপ আরো স্পষ্ট হয় যখন মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৮৮৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে এবং ১৮৮৮ সালের ১৬ই মার্চ মীরাটের বক্তৃতা মঞ্চে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন। ঢাকার খাজা মহম্মদ ইউসুফের সভাপতিত্বে 'কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন কমিটি' গঠিত হয়। এই ভাবনার স্রোত এসে মিলিত হয় শেষ পর্যন্ত মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলি ছিলেন জ্ঞান ও শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং এঁরা দুজনই সেদিন মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান ধারক ছিলেন। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকেই মুসলিম সম্প্রদায় পাঠ্য পুস্তক শুদ্ধি আন্দোলনের সূচনা করেন। এদের পুরোধা ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), মীর্জা মহম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮-১৯২০), শেখ আব্দুল রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মহম্মদ রেজাউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এই বিষয়ে বদরুদ্দিন উমরের বক্তব্য স্মরণীয় — "সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাপার হলেও তার ভিত্তিভূমি প্রথমার্ধেই রচিত হয়েছিল এবং সেই আবহাওয়াতেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চশ্রেণির সমাজ নেতারা কেবলমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা এবং উন্নতির চিন্তাই করতেন। অন্য সম্প্রদায়ের কোনও অস্তিত্ব এসব ব্যাপারে তাঁদের কাছে ছিল না।" *(পৃ: ৪৮, বদরুদ্দিন উমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৮ (তৃতীয় মুদ্রণ), কলকাতা)।*

১৮৬০ থেকে ১৯০০ এই কালপর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধিত হয়। তার ফলে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবঙ্গের যুবক সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষায়, আদব-কায়দায়

অনেকটা এগিয়ে আসতে লাগল। একটি প্রাচীন যুগকে পিছিয়ে রেখে ক্রমশই একটি অগ্রগতির ইতিহাস রচিত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ও স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত স্থাপিত হওয়ার ফলে তৈরি হল একটি আমলাতন্ত্র। শিক্ষিত হিন্দুরা সেইসব নূতন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে বুদ্ধিজীবী একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলতে লাগল। উর্দু ভাষার অপ্রচলন ও ইংরেজি ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রসার, উচ্চবর্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাসের আশঙ্কা এইবোধ থেকে জন্ম নিল আলিগড় আন্দোলন ও তার সাম্প্রদায়িক চেতনা। আলিগড় কলেজের নিজস্ব পত্রিকা 'ইনস্টিটিউট গেজেটে' (Institude Gazetee) আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক্ (১৮৮৩-১৮৯১), পরবর্তী অধ্যক্ষ থিওডোর মরিসন (১৮৯৯-১৯০৫) এবং পরবর্তী অধ্যক্ষ আর্কবল্ডের সময়কালেও এই হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আর এই সময় মুসলিম সম্প্রদায়কে বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত রাখার জন্য বৃটিশ 'তোষণ নীতি' কার্যকরী হয়। বিভিন্ন শহরে ও মফঃস্বলে যতগুলি এ্যাসোসিয়েশন বা আঞ্জুমানে ছিল তারা সবাই সৈয়দ আহমেদের কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে কেবলমাত্র যোগদানই করেনি, বরং সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে কংগ্রেস বিরোধী 'স্বাক্ষরতা অভিযান' চালায়। ঢাকায় খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের নেতৃত্বে যেমন কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন কমিটি গঠিত হয় অন্যদিকে তৎকালীন বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকায় কংগ্রেসের দ্বারা যে সুফল পাওয়া যাবে না তা সুনিশ্চিত হতে থাকে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বৃটিশ সরকার Devide & Rule নীতি অনুসারে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ক্ষমতাশালী মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঢাকার নবাব সালিমুল্লাহ ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে 'মোহমেডান প্রাদেশিক ইউনিয়ন' গঠন করে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মুসলমান সমাজকে উজ্জীবিত করেন। অন্যদিকে মুসলমান প্রজা অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গে ভূ-সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কায় জমিদার সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে ১৯০৬-০৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। ১৯০৬ সালে তৈরি হল মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের কার্যধারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল। মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র — মুসলিমদের কার্যধারা তা প্রমাণ করতে পারলেও অনেক মুসলিম নেতাই উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রতি

আকৃষ্ট হন। বাংলার বাইরে বিপ্লবী রাজনীতি ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের (১৮৭২-১৯৫০) সঙ্গে মিলিত হন হাকিম আজমল খান (১৮৬৫-১৯২৭), মজহর-উল-হক (১৮৬৬-১৯৩০), মৌলানা মহম্মদ আলি (১৮৭৩-১৯৩৮), আব্দুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) প্রমুখ চরমপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

এরপর ১৯০৬ সালে জাতীয় পরিষদ গঠিত হল। ১৯০৭ সালে সুরাট জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পরই কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী মতবাদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ১৯০৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে কলকাতা ময়দানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি বিকৃতকরণ ও আলকাতরা নিক্ষেপের ঘটনা থেকে ইংরেজের ভারতবাসীর প্রতি নির্মমতা আরো চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। এই সময় রাজদ্রোহ আইন বলবৎ হয়। এরই মধ্যে একদিকে যেমন অজিত সিং-এর 'ভারতীয় দেশভক্তদের সঙঘ' প্রতিষ্ঠা হয়, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকা, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯০৮ সালে কাশীতে 'অনুশীলন সমিতি' গঠিত হয়, যা পরে 'ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন' নামে পরিচিতি লাভ করে। বিদেশ থেকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখে দেশে ফিরে এলেন হেমচন্দ্র কানুনগো (১৮৭১-১৯৫০)। ১৯০৮ সালেই আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। এই সময় সমস্ত দেশব্যাপী সন্ত্রাসবাদী বা চরমপন্থী আন্দোলন চরমে উঠলে ১৯০৮ সালের ১৩ই জুন ক্ষুদিরামের (১৮৮৯-১৯৬০) ফাঁসির হুকুম হয়, যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব ফেলে। ১৯১০ সালে হিন্দুসভা (পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভা) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে থেকেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের রূপ পরিলক্ষিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) এবং রাসবিহারী ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৫) প্রমুখ চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা করেন বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১), অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) প্রমুখ। এঁদের আন্দোলনের ধারা ছিল গুপ্ত বিপ্লবের পথ। "বিদেশি দ্রব্য বয়কট করে বাংলা সমগ্র ভারতের স্বদেশী শিল্পোন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করেছিল। ... স্বদেশ, সংস্কৃতিতে শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির দরবারে বাংলাদেশ তখন ভারতের

আদর্শ।" *(পৃ: ২৬, কমল চৌধুরী, সংকলন, সম্পাদনা, বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫)* ইংরেজের কঠিনতম অত্যাচার থেকে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে বাংলার যুবসমাজ সশস্ত্র আন্দোলনের রক্তিম পথকেই বেছে নিয়েছিলেন সেদিন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মুসলমান মধ্যবিত্তের মানসিক ও রাজনৈতিক চেতনার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯০৫ সালের বয়কট আন্দোলনে ৭ই আগস্ট টাউন হলে ও কলকাতা ময়দানের সভায় মুসলিম সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকায় ও রাজাবাজারের সভায়ও তারা যোগদান করেন। এমনকি বঙ্গভঙ্গের দিন সারা দেশে যে অরন্ধন ও রাখিবন্ধন ব্রত পালিত হয়েছিল তাতেও মুসলমান সমাজের সমর্থন ছিল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলেজ স্কোয়ার থেকে ছাত্রদের যে মিছিল বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে সমর্থন জানিয়ে বেরিয়েছিল তাতে কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করেছিল। 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান' নজরুলের (১৯০০-১৯৭৬) এই বাণী সঞ্চারিত হয়েছিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে বেশ কিছু মুসলিম নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন — এঁদের মধ্যে মৌলবি লিয়াকৎ হোসেন, মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, ডাক্তার আব্দুল গফুর, মহিবুর রহমান, আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত মুসলিম তরুণ যেমন হাকিম আজমল খান (১৮৬৫-১৯২৭), মজহর-উল-হক (১৮৬৬-১৯৩০), আব্দুল রসুল (১৮৭০-১৯১৭), আব্দুল হালিম গজনভি (১৮৭২-১৯৩৯), মৌলানা মহম্মদ আলি (১৮৭৩-১৯৩৮) প্রমুখ নেতা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক ছিলেন। এমনকি, এই সময় বিদেশি বয়কট ও স্বদেশী শিল্পয়ানা সংক্রান্ত আন্দোলনের কালে একজন মুসলিম নারী খায়রন্নেসা (১৮৭০-১৯১২) — তিনি স্পষ্টভাবে নারীদের বিদেশি দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানান — "ভগ্নিগণ, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশি শাড়ি পরিত্যাগ করি; বিলাতি বডিজ, সেমিজ ও মোজা ইত্যাদি ঘৃণার চক্ষে দেখি, লেভেন্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডী সু পায়ে দিয়া হুচ্ট খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তবেই আমরা স্বদেশের অনেক উপকার করিতে পারিব। ... যদি কোন পুরুষ বিদেশি দ্রব্যের পক্ষপাতীও হন, তবে আমাদের অনুনয় ও বিনয়ে কি তাহা ছাড়ান যায় না? অবশ্য যায়, যদি না পারি তবে

আমরা অর্ধাঙ্গিনী কিসে?" *(খায়রন্নেসা, নবনূর, ১৩১২, আশ্বিন সংখ্যা; তথ্য ঋণ : পৃ: ৪৪, জানানা মহ্‌ফিল বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা, ১৯০৪-১৯৩৮, শাহীন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, স্ত্রী, ১৯৯৮)।*

মুসলিম সম্প্রদায়ের ইংরেজ তোষণ নীতির মোহমুক্তি ঘটেছে ধীরে ধীরে। নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তের মনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বাসনা থেকে ও ইংরেজের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা আদায় করতে না পারায় তারা ইংরেজ তোষণ নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। "এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখা যায় মওলানা আবুল কালাম আজাদের মধ্যে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর 'আল-হিলাশ' পত্রিকা (উর্দু) এই নতুন মনোভাবের প্রকাশেই কেবল নয়, প্রচার ও প্রসারেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই এটা মোটেও বিচিত্র নয় যে, তাঁর পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছিল আর প্রথম প্রকাশের তিন বছরের মধ্যেই সরকার সে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে বসেছিলেন।" *(P. 195, Wilfred Cantwell Smith, Modern Islam in India (2nd Edn. London 1945; তথ্যঋণ : পৃ: ৮৭, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য আনিসুজ্জামান (১৭৫৭-১৯১৮), প্যাপিরাস, ২০০১)।*

এছাড়া ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় মুসলিম মানসে প্রবল আঘাত হানে। তুরস্কের পক্ষে ভারতে জনমত গঠনের ব্যাপারে মহম্মদ আলী (১৮৭৩-১৯৩৮) ও মওলানা শওকত আলীকে (১৮৭৮-১৯৩১) সরকার বন্দী করে ও মওলানা আজাদকে প্রথমে কলকাতা থেকে বহিষ্কার ও পরে রাঁচীতে অন্তরীণ রাখা হয়। এই সমস্ত ঘটনার প্রভাবে মহম্মদ আলী জিন্নাহের (১৮৭৬-১৯৪৮) মুসলিম লীগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী ঐক্যমত্য গড়ে উঠল। ফলে ১৯১৮ সালে লীগ ও কংগ্রেস মিলিতভাবে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের (১৮৭৯-১৯২৪) শাসন সংস্কার পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা প্রবাসী ভারতীয়দের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করলে, গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এইভাবে ভারতীয়

রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ লাভ ঘটে। বিহারের চম্পারণে নীল চাষীদের আন্দোলন, গুজরাটের কৈরাতে কৃষকদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন ও আমেদাবাদে সূতা কল শ্রমিকদের আন্দোলনে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন এবং ধীরে ধীরে রাজনীতিতে তার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষক সরকারকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে যে আন্দোলন করেন গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেই আন্দোলনই 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' রূপে পরিচিত। এরপর 'রাওলাট বিল' আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সারা দেশে হরতাল বা ধর্মঘট পালিত হয় গান্ধীজীর নেতৃত্বে। এই ধর্মঘট হিন্দু-মুসলমানকে এক পতাকাতলে নিয়ে আসে। আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বিখ্যাত জামা মসজিদে মুসলিমদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন।

১৯১৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অ্যানি বেসান্তের (১৮৪৭-১৯৩৩) দায়িত্বে 'হোমরুল লীগ' নামক একটি পৃথক সংস্থা স্থাপিত হল যা আয়ারল্যান্ডের হোমরুল লীগের অনুসরণে তৈরি হয়। তিলকের অনুপ্রেরণায় এমনকি আমেরিকার সানফ্রানসিস্কোতেও হোমরুলের শাখা তৈরি হয়েছিল। হোমরুল আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব হল যে, হোমরুল আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণের জনগণের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা সঞ্চার করেছিল। যে সকল অঞ্চল ও সামাজিক শ্রেণী এতদিন জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রান্তরে এখন তাদের আগমন ঘটল। ১৯১৮ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের দ্বারা ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুইভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রদেশগুলিতে দ্বৈত বা যুগ্ম শাসন নীতি প্রবর্তিত হয়। কেন্দ্রে দুটি কক্ষযুক্ত আইনসভা গঠিত হয়।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের পূর্বদিকে অবস্থিত জালিয়ানওয়ালাবাগের উদ্যানে দশ হাজার লোকের সমাবেশে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে সেই নিরস্ত্র ভারতীয়দের গুলি করা হয় — যাতে অন্তত সহস্রাধিক ভারতীয় মারা যায়। বৃটিশের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চার্চিল, হার্বার্ট এসকুইথ-এর মতো ব্যক্তিত্বরা মর্মান্তক ও নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেন। এদিকে তুরস্কের খলিফার প্রতি আনুগত্য ও তুরস্কের সুলতানের জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করার অপরাধে বৃটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তির তুরস্ক

সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের ঘটনায় ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এরপব শুরু হয় খিলাফৎ আন্দোলন — যা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে এবং এই আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গান্ধীজীর সঙ্গে মুসলিম বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হলে ৭ কোটি মুসলমানের সাহায্যে ২৩ কোটি হিন্দু জনগণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

কিন্তু এর পরবর্তীকালে যে ইতিহাস তা নিঃসন্দেহে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দূরত্ব নির্মাণের ইতিহাস। ১৯২৫ সালে লালা লাজপত রায়ের (১৮৬৫-১৯২৮) সভাপতিত্বে 'হিন্দু মহাসভা'র প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মের সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রচার সাধিত হয়। ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ত্ব আইনের সংশোধনের ফলে গ্রামাঞ্চলে জমিদার রায়তের বিরোধ সহজেই সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত হয় এবং হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের বিপর্যয় ঘটে। ১৯৩০ সালে ঢাকায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে এবং ১৯২৬-১৯৩০ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব ভারতের রাজনীতিতে পড়ে। মুসলিম স্বার্থ রক্ষার প্রভাবশালী দুটো প্রতিষ্ঠান 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স' ও 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বজায় রাখার জন্য মুসলিমদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকে। মহম্মদ আলি জিন্না রচিত 'চোদ্দ পয়েন্টে' ও একই উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং ভারতীয় সাংবিধানিক সমস্যার সমাধানের জন্য যে গোল টেবিল বৈঠক হয় তাতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম স্বার্থের কথাই ব্যক্ত করেন। এই প্রেক্ষাপটে "জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা জোর দেন ভারতীয় নারীর সুপ্ত শক্তির ওপর। রাষ্ট্রকে তাঁরা বন্দনা করেন মাতৃরূপে যার শৃঙ্খলমোচন করাই ভারতবাসীর প্রথম রাজনৈতিক কর্তব্য বলে চিহ্নিত হয়। ফলে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ভারতের জাতীয় সত্তা ও নারীর সত্তার মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়।" *(পৃ: ১৮, সুপর্ণা গুপ্ত সম্পাদিত, ইতিহাসে নারীর শিক্ষা — প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, ১ম সংখ্যা।)*

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল অগ্নিযুগের

বিপ্লবীদের পরিবারের নারীরা সেই আন্দোলনে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেউ এসেছিলেন অহিংস পথে, কেউবা সহিংস পথে। মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০ সাল), সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯ সাল), বাসন্তী দেবী (১৮৮০ সাল), নেলী সেনগুপ্তা (১৮৮৬ সাল)-র মত নারীরা অহিংস আন্দোলনের শরিক হন। অন্যদিকে ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবী (১৮৮৩ সাল), দুকড়িবালা দেবী (১৮৮৭ সাল), মনোরমা বসু (১৮৯৭ সাল)-র মত বীরাঙ্গনা নারীবৃন্দ দেশের স্বাধীনতার জন্য হাতে পিস্তল তুলে নিয়েছিলেন। এই সময়কালে বাংলাদেশে যে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল তাতে নেতৃত্ব দান করেছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত (১৮৯২ সাল), সন্তোষ কুমারী গুপ্ত (১৮৯৭ সাল), বিমল প্রতিভা দেবী (১৯০১ সাল), জোবেদা খাতুন (১৯০১ সাল), সুধা রায় (১৯১১ সাল), বেগম সাকিনা (?) এদের মত লড়াকু নারীবৃন্দ। "ময়মনসিংহের দু'জন মুসলিম মেয়ে রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন অল্প বয়সেই ১৯৩০-৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল। ... ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে কাজ করেছেন গোঁড়া ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের আরো চারজন মহিলা। তাঁদের নাম শামসুননেশা বেগম (ঢাকার গোলাম জিলনীর মা), রওশন আরা বেগম (গোলাম জিলনীর স্ত্রী), রাইসা বানু বেগম, বদরুন্নেসা বেগম।" *(পৃ: ২৮৪, কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কলকাতা, ১৫ আগস্ট, ১৯৬০।)* ১৯২৮ সালে সাইমন বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্ত, বনলতা সেন, লীলা নাগ ইত্যাদি মহিলাবৃন্দ। ১৯২৬ সালে লীলা নাগের নেতৃত্বে 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে নারী নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন। সেই সময় মহিলা রাজবন্দীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বীণা দাশ, উজ্জ্বলা মজুমদার, সুহাসিনী গাঙ্গুলীরা। "সীমিত সুযোগ, পরিবেশের বাধা, সামাজিক পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও এই জাগরণের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু নারী ব্যক্তিত্বের দেখা পাওয়া গেছে। তাঁদের কেউ কেউ নারীর অধিকার, মানুষ হিসাবে তাঁর মর্যাদা, অবরোধ প্রথা দূর করা, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এসব নিয়ে আন্দোলন করেছেন।" *(পৃ: ৯৮, মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২)* কৃষক আন্দোলন থেকে শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, এমনকি বৃহত্তর

সাংস্কৃতিক আন্দোলন, নারীশিক্ষা-নারীমুক্তি আন্দোলনের নূতন নূতন পথ তৈরি হয়েছিল সেই অগ্নিযুগের নারীবৃন্দের হাতেই। রাজনৈতিক এই কালবদলের সময়ে প্রগতিশীল হিন্দু রমণীদের সঙ্গে একই পথের সাথী হয়েছিলেন একজন মুসলিম নারী বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক দিক দিয়ে নানা পালা বদলের কাল। একটি প্রবহমান পরিবর্তনশীলতা সমাজে বর্তমান ছিল। সেই পরিবর্তনকে ধরে শিক্ষাচিত্রটি কেমন ছিল তা দেখা যাক্। পরিবর্তনের সেই কালে শিক্ষার প্রসার, বৃটিশের শিক্ষানীতির প্রসার, নারীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার, মুসলিম সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে একটি পরিবর্তনের বাতাবরণ তৈরি হয়। ১৮২৩ সালে জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। ১৮৫৪ সালে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ কনট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশপত্র বা Education Despatch পাঠান। ১৮৫৪ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত যে সময়কাল তাতে শিক্ষা বিস্তারের বহুধাব্যাপ্ত রূপ পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি পৃথক শিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। ১৮৫৭ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছিল ২১.৬ লক্ষ টাকা, ১৮৭০ সালে ৬৫-৭১ লক্ষ টাকা, ১৮৮২ সালে তা দাঁড়ায় ৭২ লক্ষ টাকায়। ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারের (১৮৪০-১৯০১) নেতৃত্বেই ভারত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। সরকারি ব্যয়ে শিক্ষাদান ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগেও শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য ১৮৯৬ সালে ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিস গঠিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত উচ্চপদেই ছিলেন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তখন ইংরেজি ভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রচলন না হওয়ায় অনেকেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়।

ইংরেজ শাসনকালের প্রথম পঞ্চাশ বছর ১) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোন নির্দিষ্ট শিক্ষানীতি ছিল না, ২) শিক্ষিতের তুলনায় অশিক্ষিত ভারতবাসীকে শাসন করা অনেক সহজ, ৩) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেদেশে শিক্ষাপ্রচারের ফলে, ৪)

এদেশে টোল চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা মক্তবে ধর্ম শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল, ৫) ধর্মভীরু ভারতবাসী খৃষ্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ধর্মের ভয়ে পড়তে আসবে না — এই সমস্ত কারণগুলি শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম দিকে বৃটিশদের উদাসীন থাকতে বাধ্য করেছিল বলে মনে হয়। পরে শুধু ইংরেজি শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল মাত্র। এমনকি মাদ্রাসা ও সংস্কৃত টোলগুলিকে তুলে দেবার কথাও ভাবা হয়েছিল। শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক না করায় বেশিরভাগ মানুষই শিক্ষার আলোক থেকে দূরে ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছিল স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর। তাই প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশের ধারাটি বেগবান হয়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে লর্ড কার্জনের (১৮৫৯-১৯২৫) শাসনকাল থেকেই শিক্ষানীতিতে ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অনুদান ৫০০ লক্ষ টাকা নিয়মিত ও ৩০০ লক্ষ টাকা অনিয়মিত অনুদান দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, নির্দিষ্ট পাঠক্রম চালুকরণ ও নিয়মিত পরীক্ষা ব্যবস্থা, সিনেট ও সিন্ডিকেট সংস্থা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে রাখা ছিল বৃটিশ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য লর্ড কার্জন প্রদেশগুলিতে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। নিম্নলিখিত সারণী থেকে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টি সহজেই প্রমাণিত হয় —

	১৮৮১-১৮৮২ খ্রী:	১৯০১-১৯০২ খ্রী:	১৯১১-১৯১২ খ্রী:
১) অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা	৮২,৯১৬	৯৩,৬০৪	১,১৮,২৬২
২) ছাত্র সংখ্যা	২০,৬১,৫৪১	৩০,১৭,৬১১	৪৮,০৬,১৩৬

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২.৬ অংশ মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসে। ভারতবর্ষে টোল- চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা তো ছিলই; তার সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের (১৮০০ সাল) ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০ সাল) অধ্যাপক গোষ্ঠীর মাধ্যমে শিক্ষার চালু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভারতে ১৮৮২ সালে স্কুলের সংখ্যা ছিল যেখানে ৩৯১৬ টি এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ২,১৪,০৭৭ জন। সেখানে ১৯০২ সালে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা

দাঁড়ায় ৫১২৪ টি ও ছাত্র সংখ্যা ৫,৯০,১২৯২১। ১৯০২ সালে কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, পাঞ্জাব ও এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে গেছে। কলেজের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার তেমন হয়নি। এছাড়া জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা তার প্রসারও তেমন সন্তোষজনক ছিল না।

সেই সময়কার ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার একটি চিত্র পাওয়া যায় —

আর্টস্ কলেজ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
ইংরেজি শিক্ষার জন্য	১৪০	১৭০৪৮ জন
প্রাচ্য শিক্ষার জন্য	৫	৫০২ জন
বৃত্তিমূলক শিক্ষার কলেজ	—	—
আইন	৩০	২৭৬৭ জন
চিকিৎসাশাস্ত্র	৪	১৪৬৬ জন
কারিগরি	৪	৮৬৬ জন
শিক্ষক-শিক্ষণ	৫	১৯০ জন
কৃষি	৩	৭০ জন

(পৃ: ১৬০, সৈয়দ নুরুল্লা ও জে. পি. নায়েক A Student's history of Education India (ম্যাকমিলান, ১৯৫৬)।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বে ১৯ শতকে এক সময় বৈষ্ণবীদের দ্বারা অন্তঃপুরে শিক্ষার একটা ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে প্রথম নেটিভ ফিমেল স্কুল স্থাপিত হয়। হ্যানা মার্শম্যান, মিস্ কুক ও এ্যানেট অ্যাক্রয়েড বিভারিজের নিরলস পরিশ্রমের ফলে বেশ কয়েকটি লেডিজ স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। মিশনারীদের প্রয়াসে যে সব স্কুল স্থাপিত হয় তার মধ্যে প্রথম হল ১৮১৮ সালে রবার্ট মে-এর প্রচেষ্টায় চুঁচুড়ার বালিকা বিদ্যালয়টি। কলকাতা শহর ও শহরতলিতে গৌরিবাড়ি, জানবাজার, চিৎপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এবং কলকাতার বাইরে কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর, হুগলী, ঢাকা ও যশোহর ইত্যাদি অঞ্চলেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইসব স্কুলে পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল এবং কৃতিদের নানারকম উপঢৌকনও পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হত। ১৮২৭ সালে এইরকম স্কুলের সংখ্যা ছিল

প্রায় ৩০টি, আর ছাত্রী ছিল আনুমানিক ৩০০ জন। এই সমস্ত স্কুলে দেশীয় মেয়েদের পাঠানো হত না। কারণ নারীর শিক্ষার প্রয়োজন একথা সেদিনের হিন্দু সমাজ বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই এই সমস্ত স্কুলে হিন্দু মেয়েদের পাঠানো অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হত। "নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের সহানুভূতির অভাবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতার ফলে এ সব বিদ্যালয়ে তাই কেবল বাগদী, ব্যাধ, বৈরাগী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণির হিন্দু এবং বেশ্যা কন্যাই পড়তে যায়" — *(পৃ: ৯১, বঙ্গদূত, সমাচার দর্পণ, ১৮৩১, ২৫ জুন; তথ্যঋণ : পৃ: ২৭, গোলাম মুরশিদ, 'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী' নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১।)* রক্ষণশীল দলের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) বা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮) কিম্বা রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের (?-১৮৫৯) মত সহৃদয় ব্যক্তিবৃন্দ আর্থিক সহায়তাদানে নারীশিক্ষাকে অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে যান। হিন্দু কলেজের ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২-১৮৯১) প্রমুখ ব্যক্তির নিয়মিত প্রচেষ্টা। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন' (১৮২৮ সাল) নারীশিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮৪৫ সালে উত্তর পাড়ায় জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের, ১৮৪৭ সালে বারাসাতে প্যারীচরণ সরকারের (১৮২৩-১৮৭৫) অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, ১৮৪৯ সালে সিমুলিয়ায় রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের (১৮১৪-১৮৭৮) হিন্দু ফিমেল স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এই হিন্দু ফিমেল স্কুলটি বেথুন স্কুল নামে নারীশিক্ষার প্রথম ফলক রূপে বিরাজ করছে। আর এই স্কুল থেকেই স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু প্রথম বি. এ. পাশ করেন। শিক্ষার আলোকে নারী জাতির মনোলোককে উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রধানত তাঁর ও বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুলসহ প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং এইভাবে নারীর অশিক্ষার সমস্যা দূরীকরণের পরিকল্পনাকে বিদ্যাসাগর কার্য্যে রূপদান করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ও অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। অবরোধ প্রথার প্রতি আনুগত্য মুসলিম সমাজে যেমন ছিল, হিন্দু

সমাজেও ছিল। বাল্যবিবাহ, অল্পবয়সে সন্তান ধারণ, বহু সন্তানের জননী হওয়া, এক পুরুষের বহুবিবাহ —ইত্যাদি কারণে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান পশুর চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না। তাই উদার আকাশের মুক্ত বাতাসে শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়া ছিল সুদূরের স্বপ্ন। কিছু ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, নারীর কল্যাণ বিষয়টি সহৃদয় পুরুষকে ভাবাতে শুরু করেছিল, যা একটি শুভ লক্ষণ। ধর্মান্তরের ভয়ে, লোক সমাজের ভয়ে, অবরোধ প্রথার কড়াকড়ির কারণে এতদিন পর্যন্ত নারীশিক্ষার থেকে সমাজ মুখ ফিরিয়েছিল। সমাজ ও সংস্কার সমগ্র জাতির জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। সেদিনের এই সমস্ত সহৃদয় কিছু মানুষ উপলব্ধি করতে লাগলেন যে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন না হলে সমাজ পরিবর্তনও অধরাই থেকে যাবে। শিক্ষিত পুরুষ এবার আর লজ্জাবনত বালিকাকে নয়, জীবনে চলার পথে যোগ্য সঙ্গিনীর সন্ধানী হয়েছে। 'কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ইংল্যান্ডের লিচেস্টারে ১৮৭০ সালের ১৭ই জুন বক্তৃতায় বলেন যে আদর্শ মা ও বিদূষী স্ত্রী তৈরি করতে পারলে ভারতবর্ষের পরিবর্তন চিরস্থায়ী হবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার হাত থেকে মুক্তি পাবে' — *(পৃ: ৩৭০, Prem Sundar Basu, (ed), Keshab Chandra Sen in England, 3rd ed, Calcutta, 1938.)* কেশব চন্দ্র সেন শুধু লন্ডনেই বক্তৃতা দেন নি, তিনি 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশনে'র সভাতেও বক্তৃতা দেন। পরবর্তীকালে 'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা' নামে বামাবোধিনী কার্য্যালয় থেকে তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। "১৮৬৩ সালে তিনি ব্রাহ্ম বন্ধুসভা স্থাপন করেন। তার তিনটি বিভাগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা ছিল অন্যতম।" *(পৃ: ১৭৫, গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৮।)* এই সভাই পরবর্তী সময়ে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা যা 'জেনানা মিশন' নামে পরিচিত তার ব্যবস্থা করে। বাড়িতে শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করাই ছিল এর পদ্ধতি। পড়াশোনার অগ্রগতির জন্য বছরে দু'চারবার রিপোর্ট পাঠাতে হত। কৃতকার্য হলে এইসব মহিলাদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাও ছিল। প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত নির্ধারিত সিলেবাস বা পুস্তক তালিকা ছিল। এইসময় যে সমস্ত খৃস্টান মিশনারীদের সহায়তায় স্কুল স্থাপিত হয়েছিল তার পাঠ্যসূচিতে ছিল যোশেফের ইতিহাস, বাইবেলের অনুবাদ ইত্যাদি।

অর্থাৎ খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্যের অনুকূল গ্রন্থগুলিই পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা যখন থেকে প্রচলিত হয়, তখন প্রথম বর্ষের পাঠ্যসূচিতে ছিল বোধোদয়, পাটিগণিত, নামতা। দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্যসূচিতে ছিল রত্নসার, নীতিবোধ, ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ব্যাকরণ চন্দ্রিকা, পাটিগণিত, জমাখরচ, পূরণ, হরণ ইত্যাদি। তৃতীয় বর্ষে ছিল কবিতাবলী, বামারঞ্জিকা, চারুপাঠ প্রথম ভাগ, ব্যাকরণ প্রবেশ, পাটীগণিত (ত্রৈরাশিক পর্যন্ত), ধর্মচর্চা ইত্যাদি। ৪র্থ বর্ষে প্রাণীবৃত্তান্ত, ব্যাকরণ, ভূগোল বিবরণ, পাটীগণিত, ত্রৈরাশিক পর্যন্ত ভগ্নাংশ সহ অন্যান্য বিষয় পাঠ্যসূচিতে ছিল। ৫ম বর্ষে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যাকরণ উপক্রমণিকা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল পাটীগণিত (সমস্ত), ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ভারতবর্ষ ছাড়া ইংল্যান্ড, রোম, গ্রিসের ইতিহাস, পাটীগণিতের ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ধাত্রীবিদ্যা, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ও যুক্ত হয়। এর থেকে এই সত্যটি স্পষ্ট হয় যে, নারীর মেধাকে মর্যাদা দিয়ে বৈচিত্র্যময় সিলেবাস তৈরি হয় এবং সেই সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়ে সেদিনের অন্তঃপুরিকাবৃন্দ শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলেন ধীরে ধীরে। কলকাতার পর 'ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা' ১৮৭০ সালে প্রাণকুমার দাস ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪৫-১৯০৪) প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। এরপর ময়মনসিংহে ১৮৭২ সালে চোরাবাগানসহ অন্যান্য স্থানেও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়িতে পাঠশালা বসত যেখানে বিবাহযোগ্য বা বিবাহিতা বা বয়স্ক নারীরাও শিক্ষালাভ করতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) 'ভারত আশ্রম' নামে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানেও বহু ব্রাহ্ম মহিলারা শিক্ষালাভ করতেন। হিন্দু মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে শ্রীহট্ট সম্মিলনী (১৮৭৬), বিক্রমপুর সম্মিলনী (১৮৭৯), বঙ্গমহিলা সমাজ (১৮৭৯) স্থাপিত হয় — নারীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে যাদের ভূমিকা অসামান্য। এইভাবে নারীশিক্ষার এক পরিবেশ পরিমণ্ডল রচিত হল। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রযুক্তিবিদ্যার পঠন পাঠন, ১৯১১ সালে বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ সায়েন্স স্থাপন, ১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে পড়াশোনা ও গবেষণার ব্যবস্থা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, পদার্থ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে মুম্বাই এ প্রথম ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় - শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর

থ্যাকারসে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় পুনাতে স্থাপিত হয়। ১৯১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল পাঁচ। ১৯২১ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হল ১২। মহীশূর, পাটনা, আলিগড়, মুম্বাই, বেনারস, লক্ষ্মৌ, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল।

সাহিত্য ক্ষেত্রে আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বাংলাভাষায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), তেলেগু সাহিত্যে বীরশা লিঙ্গম (১৮৪৮-১৯১৯), উড়িয়া ভাষায় মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১২), গুজরাটী ভাষায় মণিলাল ত্রিবেদী, গোবর্ধন রাম ত্রিপাঠী (১৮৫৫-১৯০৭), মারাঠী ভাষায় হরিনারায়ণ আপ্তে (১৮৬৪-১৯১৯) ইত্যাদি সাহিত্যিকবৃন্দের লেখনীতে পরাধীনতার যন্ত্রণা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়। এই পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) বলবৎ করে। এইসব ভাবনার পাশে পাশে নারী ভাবনা যেমন সমাজে স্থান পেয়েছে, সাহিত্যেও তেমনি প্রকাশিত হয়েছে।

এই সময়কালে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় যা, নারী ভাবনার প্রকাশই শুধু নয়, নারীর নিজের লেখাও প্রকাশিত হতে থাকে। প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪), অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) বিদ্যাদর্শন (১৮৫২), প্যারীচরণ সরকারের (১৮২৩-১৮৭৫) 'এডুকেশন গেজেট' (১৮৫৬), ১৮৬৩ সালে উমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪০-১৯০৭) সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা', শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪০-১৯২৫) দুই কন্যা বনলতা ও ঊষালতার পত্রিকা সম্পাদনা করেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৪-১৮৯৮) সম্পাদনায় 'অবলা বান্ধব' (১৮৬৯) প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭৫), ভারতী (১৮৭৭), কামিনী শীলের সম্পাদনায় 'খ্রীষ্টীয় মহিলা' (১৮৮১), 'অন্তঃপুর' (১৮৯৮), 'পরিচারিকা', 'ভারতী ও বালক', 'দাসী' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় মহিলাদের রচনা প্রকাশিত হতে লাগল এবং শিক্ষা সম্পর্কে নতুন সচেতনতার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৫ সালে এসে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ ও আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ ও চারিত্রিক বিকাশের দিকে জোর দিলেন। ১৮৯৬ সালে প্রখ্যাত জননেত্রী এ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-

১৯৩৩) জাতীয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হিন্দু-মুসলিম যে বিরোধের সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের (Social revivalism) সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। আর্য সমাজের উদ্যোগে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। লাহোরে ডি. এ. ভি. (D. A. V.) কলেজ ও হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালে জাতীয় শিক্ষার সুস্পষ্ট কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই নভেম্বর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮), রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮) ইত্যাদি নেতাদের উদ্যোগে একটি 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হয়। ১৯০৬ সালে একটি জাতীয় কলেজ ও অন্যান্য অঞ্চলে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯১১ সালে জাতীয় নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের (১৮৬৬-১৯১৫) নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে শিক্ষা বিষয়টি জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয় এবং পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের (১৮৭০-১৯২৫) নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ দলে দলে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে মহামান্য তিলকের মৃত্যুর পর ঐ সালের ১লা আগস্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগে আন্দোলন শুরু হলে গান্ধীজী পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলেন। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অবদান হল যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার প্রসার আবশ্যিক, তা না হলে জনগণ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থাকবে, এইজন্যই তিনি ইংরাজির পরিবর্তে হিন্দুস্থানীকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় —

সাল	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৮৮১	১০৪২	৪৪,০৯৬
১৮৯০	২২৩৮	৭৮,৮৬৫

১৯২০-২১ সালে এসে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির একটি পরিসংখ্যান থেকে পরিবর্তিত রূপটি পরিলক্ষিত হয় —

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
কলেজ	১৯	৯০৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৭৫	২৬,১৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১,৯৫৫	১১,৮৬,২২৪
অন্যান্য নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১,১২৮	১০,৮৩৬

উৎস : *General Report on Public Instruction in Bengal for the year 1881, 1890, 1920, 1921.*

নারীশিক্ষার অগ্রগতির আরো নিদর্শন মেলে ১৯১৬ সালে দিল্লীতে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠিত হয় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামে জাতীয় শিক্ষায়তন।

১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব (১৮০১-১৮৫১) ও বিদ্যাসাগরের যৌথ উদ্যোগে যে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ১৮৭৯ সালে এখানে কলেজ বিভাগের উদ্বোধন হয়। বেথুন স্কুলে সংস্কৃতের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় (১৮১৭-১৮৫৮) ভুবনমালা ও কুন্দমালা নামে তাঁর দুই কন্যাকে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে এই স্কুলে ভর্তি করান। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার যখন প্রচলন হয় সেই সময় কিছু বৈষ্ণবী অন্তঃপুরে গিয়ে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষা দিতেন। যোগ্য শিক্ষিকার অভাবে অনেকসময় পুরুষ শিক্ষকরাই মেয়েদের পড়াতেন। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য বেথুন স্কুলের সঙ্গে একটি নর্মাল স্কুল বা শিক্ষিকা-শিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তবে ঐ স্কুলে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত কোন ছাত্রী ভর্তি হয় নি। ১৮৭১ সালে ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় সাতজন। ১৮৬৯ সালে অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাপটিস্ট জেনানা মিশনের পক্ষ থেকে একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়। যদিও ছাত্রীর অভাবে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মূল কারণ হিন্দু সমাজের কুসংস্কার। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাল্যবিবাহ। ধারাবাহিকভাবে অশিক্ষার প্রাচীর মেয়েদের জীবনকে বদ্ধ করে রেখেছিল। অন্তঃপুরের খাঁচায় বন্দী নারীর বন্দীত্বই

যেন সত্যি; পায়ের শিকল কেটে মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা যতই থাক না কেন পুরুষশাসিত সমাজ ছিল উদাসীন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবের ফলে পুরুষ জাতির সুপ্তিভঙ্গ হতে সময় লাগলেও হিন্দু সমাজে নারীর শিক্ষা, নারীর কল্যাণ, নারীর মুক্তি নিয়ে সহৃদয় পুরুষেরাই ভেবেছিলেন। অন্তঃপুরের শিক্ষা জেনানা মিশনের রূপ লাভ করলেও শিক্ষিকা হওয়ার উপযুক্ত চারিত্রিক জ্ঞান এবং সাধারণ শিক্ষা সমাজের সিংহভাগ নারীর না থাকায়, পরিবারের রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করার বাধায়, পুরুষের সংস্পর্শে আসা হিন্দু সমাজের নিয়ম-বিরুদ্ধ হওয়ায় এই ব্যবস্থা সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। ১৮৯০ সালের ৬ই মে শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) উদ্যোগে 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮১ সাল থেকেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং লেডিজ জুভেনাইল সোসাইটির সদস্যারা এবং অন্যান্যরা সকলেই স্ব স্ব মহিলা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য — শ্রীহট্ট সম্মেলনী (১৮৪৭), ব্রাহ্মিক সমাজ (১৮৬৫), আর্য নারীসমাজ (১৮৭৯), বঙ্গমহিলা সমাজ (১৮৭৯), বিক্রমপুর সম্মিলনী (১৮৭৯), ভারত শ্রীমহামন্ডল, আর্যসমিতি (১৮৮২), সখী সমিতি (১৮৮৬), মহারাণী পাঠশালা (১৮৯৩), নারীশিক্ষা সমিতি (১৯১৯), আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম (১৯১৯)। ১৮৮৬ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্যোগে 'সখী সমিতি' স্থাপিত হয় যার কর্মপ্রণালী ছিল নানামুখী। এই সভায় ব্রাহ্ম ছাড়া হিন্দু, মুসলিম সম্প্রদায়ের যে কোন মহিলা বিধবা, অনূঢ়া সবাই এর সদস্য হতে পারতেন। "অসহায় বিধবা ও অনূঢ়াদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করাও এ সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 'সখী সমিতি'র আর একটি কাজ ছিল বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহিত উপাদান দিয়ে হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করা।" *(পৃ: ১১৫, স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ, অভিজিৎ সেন, অভিজিৎ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিকল্প, কলকাতা, ১৯৯৮।)* এই সমিতির সদস্যরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। এর সদস্য ছিলেন নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীও।

১৮৯৩ সালের ২৯শে এপ্রিল 'মহারাণী পাঠশালা' নামে একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী নামে এক সন্ন্যাসিনী। তাঁর পূর্বনাম ছিল গঙ্গাবাঈ। প্রথমে ৩০টি ছাত্রী নিয়ে অবৈতনিক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই কার্যক্রম শুরু হয়, পরে এই মহারাণী পাঠশালার আরো ১৬টি শাখা গড়ে ওঠে। তবে এই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সেলাই, আঁকা, বোনা, রান্না করা ও পূজা পদ্ধতি ইত্যাদি শেখানো হতো — যা নারীকে সুগৃহিণী হতে সাহায্য করে। ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) ও ঐ একই রকম সনাতন হিন্দু আদর্শ প্রবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই ১৮৯৮ সালে বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৭ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়। এই একই সময় অর্থাৎ ১৮৯৮ সালেই ঢাকায় ইডেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নারীশিক্ষার জন্য।

রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯ সাল), কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮৩৭ সাল), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ সাল), তরু দত্তের (১৮৫৬ সাল) জন্ম। এই সময়কালের যে সমস্ত নারীরা শিক্ষিত হয়েছিলেন তারা বেশিরভাগই শিক্ষালাভ করেছিলেন বিবাহের পর। এই বিষয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্রাহ্ম স্বামীর প্রসন্নতা ও তত্ত্বাবধানেই তাঁরা শিক্ষিতা হয়ে ওঠেন। "এই পর্যায়ে সবচেয়ে ভালো লেখাপড়া জানতেন সেইসব মহিলা যাঁরা নিজ চেষ্টায় বাড়িতে স্বামী অথবা অন্য কোনো আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখতেন। এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি তখন জেনানা অথবা অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী বলে পরিচিত ছিল। যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করতেন অথচ ঐতিহ্যিক মূল্যবোধে আস্থাশীল ছিলেন, তাঁরা এ পদ্ধতির শিক্ষাকে পছন্দ করতেন।" *(পৃ: ৩১, গোলাম মুরশিদ, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ।)* এই সময়কার আলোকিতা নারীদের মধ্যে প্রথম রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, কুমুদিনী দেবী (১৮৪০-১৮৬৫), নিস্তারিণী দেবী, (১৮৪০-১৮৬০), অন্নদায়িনী লাহিড়ী (১৮৪৮-?), মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬), (বৈষ্ণবী, খ্রীষ্টান মেম ও স্বামীর তত্ত্বাবধানে), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১), সৌদামিনী দেবী (?-১৮৭৪), স্বর্ণকুমারী দেবী (অন্তঃপুরে বৈষ্ণবী ও মেম সাহেবের কাছে), তরু দত্ত (খৃস্টান পিতার কাছে বাড়িতে, পরে বিদেশযাত্রা করে শিক্ষালাভ করেন) — ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে এঁরাই প্রথম বই হাতে তুলে নিয়েছিলেন, আজ আমরা তাঁদেরই ঐতিহ্য বহন করে চলেছি। সেই প্রথম নারী জাগরণের যুগে বহু তরুণ ব্রাহ্ম যুবক পরিবারের অলক্ষ্যে গোপনে স্ত্রীদের শিক্ষিত

করে তুলছিলেন; সেই সব সহৃদয় সাথীদের জন্য নারী শুধু যোগ্য স্ত্রী হবার জন্যই নয় — নিজের চেতনার জাগরণের জন্যও বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন। তাই নির্মোক মুক্তির প্রথম যুগে ১৮৬৩ সালে প্রথম ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবীর গুপ্ত প্রেস, কলকাতা থেকে 'হিন্দু অবলার হীনাবস্থা' নামক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধেই তিনি স্ত্রী শিক্ষায় পুরুষের অনীহার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে — "কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকল জাতীয় শাস্ত্রেই কথিত আছে যে পত্নীরা পতির অর্ধ অঙ্গস্বরূপ এবং সুখ ও দুঃখের সমভাগী, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অর্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্ধেক পরিত্যাগ করিতেন অর্থাৎ দুঃখের অংশটি বিলক্ষণরূপে প্রদান করিতেন কিন্তু সুখের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন। নচেৎ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বনিতাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহারদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিম্বা গৃহকার্যে উপেক্ষা করত: কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ...।" *(পৃ: ১১-১২, কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা (কলকাতা, গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৩)।)* জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও সেই মত প্রকাশ করেছেন। 'একমাত্র শিক্ষাই তেমন আধুনিক স্ত্রী তৈরি করতে পারে, যা আধুনিক স্বামীরা চান' — *(পৃ: ২৬৩, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্ত্রীশিক্ষা, ভারতী, ১২৮৮, আষাঢ়; তথ্যঋণ : পৃ: ৩০-৩৬, গোলাম মুরশিদ, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গনারী, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, ২০০১)*

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫) কবি হিসেবে পরিচিতা, তিনি বলেন, 'সে শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা স্ত্রীকে স্বামীর প্রিয়া, পরিচালিকা, বন্ধু ও শিষ্যে পরিণত করে।' *(পৃ: ১০৫, প্রিয়ম্বদাদেবী, স্ত্রীশিক্ষা, অন্তঃপুর (১৯০১) ৪র্থ বর্ষ; তথ্যঋণ : পৃ: ৩০-৩৬, গোলাম মুরশিদ, ঐ)*

সমকালের প্রথম মুসলিম নারী গদ্যলেখিকা তাহেরেন্নুসাও বলেন যে সমাজে মহিলাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞানতা ও অনগ্রসরতার জন্যে তারা সে ভূমিকা পালনে অক্ষম। বাসন্তীকুমারী বসু আর একজন লেখিকা যিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুত্রকে কন্যা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং কন্যাকে শিক্ষা থেকে দূরে

রাখার বিষয়ে তার অভিযোগ লিখেছিলেন — *(পৃ: ১০৯, বাসন্তীকুমারী বসু, স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার বর্তমান অবস্থা, অন্তঃপুর (২য় বর্ষ) ১৮৯৯; তথ্যঋণ : পৃ: ৩০-৩৬, গোলাম মুরশিদ, ঐ)* এইসব ভাবনাচিন্তার মিলিত রূপ পরবর্তীকালে বলিষ্ঠতা লাভ করেছে নারী প্রগতির অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার রচনা ও কর্মে।

সামাজিক দিক দিয়ে নারীর সম্মানজনক স্বীকৃতি সমাজে কোনদিনই ছিল না। তার ওপর পরম্পরাক্রমে বিদ্যার সঙ্গে অনিবার্য বৈধব্যকে মিলিয়ে যে প্রবাদ সংস্কারে প্রচলিত ছিল আস্তে আস্তে নারীর এই সংস্কার মুক্তি ঘটেছে। উদারনৈতিক সমাজ-নেতাদের চিন্তা-ভাবনায় নারীকে প্রাধান্য দেবার মত মানসিকতা গড়ে উঠলেও বিদ্যাশিক্ষায় নারীর উন্নতির কথা তাঁদের ভাবতে অনেক সময় লেগেছিল। প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দেবী আত্মজীবনীতে লিখেছেন কিভাবে সবার অলক্ষ্যে রাতে চেলা কাঠের নীচে থেকে চৈতন্য ভাগবতটি গোপনে বার করে তাকে পড়তে হত। কারণ নারীশিক্ষার গোপনীয়তাই সমাজে বর্তমান ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার চল হলেও সমাজের বেশিরভাগ যে অশিক্ষিত নারী সম্প্রদায় তারা অন্তত সেই শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পান নি। এর পিছনে আরো একটি বড় কারণ ছিল তা হল অবরোধ প্রথা। যে প্রথার কঠোরতা নারীকে ইতর শ্রেণীতে নামিয়ে এনেছে। অবরোধপ্রথার দুরবস্থার একটি চিত্র মেলে রাসসুন্দরী দেবীর রচনায়। স্বামীই যে পরিবারের কর্তা, তাই সেকালে কর্তার সঙ্গে স্ত্রীর দেখা হত মাত্র রাত্রে। একবার স্বামীর ঘোড়া জয়হরি বাড়ির ভেতরে ধান খেয়ে যাচ্ছে দেখেও রাসসুন্দরী তাকে তাড়াতে পারছেন না। কারণ ঘোড়াটা হল কর্তার। দিনের বেলায় কর্তার ঘোড়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়াও যে সমাজে অপরাধ সেই সমাজে থেকে রাসসুন্দরী প্রথম আত্মজীবনী লিখলেন — এইখানেই নারীর ইচ্ছাশক্তির জয়। সেই ইচ্ছাশক্তি ও তার সঙ্গে হৃদয়বান স্বামীর প্রযত্নে শিক্ষিত হয়ে প্রথম গদ্যগ্রন্থের লেখিকার সম্মান পান কৈলাসবাসিনী দেবী, ১৮৬৩ সালে তাঁর প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনিও বিশেষভাবে হিন্দু সমাজের নারীদের দুর্ভাগ্যের কথা বলেছেন, যার মূলে আছে বাল্যবিবাহ, বিধবার সমস্যা ও কৌলীন্য প্রথা।

হিন্দু সমাজের প্রাথমিক পর্বে নারীশিক্ষার যে চিত্রটি পেলাম, এবার মুসলিম সমাজের নারীশিক্ষার চিত্রটি বা কেমন ছিল তা জেনে নেওয়া দরকার। ফৌজদারী কার্য্য

পরিচালনায়, "বিচার কার্য্যে ইংরেজ জজদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এক একজন মৌলবী সঙ্গে থাকিতেন, কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইত। এই অভাব দূর করিবার জন্য এবং মৈত্র প্রদর্শন দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমান সমাজকে প্রীত করিবার আশয়ে, প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাদুর কলিকাতাতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহদাতা ও সহায় হইলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে উক্ত মাদ্রাসা স্থাপিত হইল।" *(পৃ: ৫২-৫৩, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, বিশ্ববাণী, কলিকাতা, ১৯৮৩)* কিন্তু এত প্রাচীন একটি মাদ্রাসা থাকলেও মুসলিম সমাজে শিক্ষার অগ্রগতি খুবই ক্ষীণ ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মানসেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনার সময় ইংরেজি, বাংলার সঙ্গে উর্দু, ফারসী ভাষা শিক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু ১৮২৩ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন উঠলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। — 'The question of Muhammadan learning presents a variety of facts, some of which are of fascinating complexity.' *(পৃ: ৫০, Pradip Sinha, Ninteenth Century : Aspect of Social History - Firma, K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1965.)*

মুসলিম সমাজে অভিজাত শ্রেণী অর্থাৎ আশরাফ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল সামান্য। কিন্তু আতরফ বা অনভিজাত শ্রেণীতে শিক্ষার সুযোগ ও প্রচলন ছিল না বললেই চলে। কিছু মক্তব বা মাদ্রাসা ছিল যেখানে ধর্মের বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হত। ইংরেজ এদেশে আসার পর ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের ফলে হিন্দুদের প্রাচীন শিক্ষাধারার টোল চতুষ্পাঠীর স্থান গ্রহণ করল বিদ্যালয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মশিক্ষার বই সবই লেখা হত ফারসী-উর্দুতে — তাই মুসলিমদের কাছে ইংরেজি নিতান্ত বিদেশি ভাষা হয়েই রইল। সেই ভাষাকে আত্মস্থ করতে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সময় লেগেছিল, মুসলিম সমাজের তার চাইতে অনেক বেশি সময় লেগেছিল। যদিও ফারসী ভাষার আভিজাত্য অনস্বীকার্য। কারণ অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র ও আধুনিক যুগে রাজা রামমোহন ও ফারসী

ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রামমোহনের সম্পাদনায় যে পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হত 'মীরাৎ-উল-আখবার' (১৮২৩) বা 'তুহাফাতুল মওয়াহিদিন' সবই ফারসীতে রচিত। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন সে যুগের যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায় তাঁরাই নানা সরকারি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের বিলম্বের কারণ নির্দেশ করেছেন সমালোচক এইভাবে — "The system and course of studies offered to them was defective and their only institution was very badly managed and inefficienty run. Again, the early efforts of the company to educate the people were made in the City of Calcutta where the Hindus predominated. The overwhelming Muslim majority districts of East and North Bengal did not receive the much needed attention of the Government till very late. Another factor was the known poverty of the Muslims which made it impossible for them to educate themselves without adequate help from Government. Without ascribing any motive, whatsoever, it can also he said that the policy of the ruling authorities was often faltering and in must cases, though well-intentioned, it served to benefit the Hindus rather than the Muslims." *(পৃ: ১৯৩, A. R. Mallick, British Policy and the Muslims of Bengal, Dacca, 1961.)*

সরকারের নীতি ও শিক্ষা সংস্কার মুসলিম সমাজ মেনে নিতে না পারায়, দারিদ্র্যের কারণে এবং ফারসীর স্থানে ইংরেজি ভাষা অর্থাৎ ভাষা হারানোর বেদনা ও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতা সব ক'টি কারণ একত্রিত হয়ে মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পথ থেকে অনেকটা দূরে সরে আসে। যেখানে হিন্দু সমাজে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে নারীশিক্ষা আন্দোলন ও নারী স্বনির্ভরতার পথ পর্যন্ত তৈরি হয়ে যায়, সেখানে মুসলিম সমাজে ১৮৫১ সালে মাদ্রাসা থেকে মাত্র দু'জন ছাত্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এঁরা হলেন নবাব আব্দুল লতিফ ও ওয়াহিদউন্নবী। এই একই সময় হুগলী কলেজ থেকে মাত্র দুজন ছাত্র উত্তীর্ণ হন — এঁরা হলেন মুসা আলী ও ওয়ারিস

আলী। এই অবস্থার উন্নতি হয়েছিল যখন ১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসী বিভাগ প্রবর্তন হয় ও হিন্দু ছাত্রদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ খরচে ইংরেজি শেখার সুযোগ পান মুসলিম ছাত্ররা। এই সুযোগ পেয়ে ১৮৫৭ সালে ১৫৮ জন ছাত্র ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন। নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলি সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষিত এই দু'জন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বাঙালী মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কিনা এই নিয়ে মুসলিম সমাজ দ্বিধান্বিত ছিল। এর পূর্ববর্তী সময় বৃহত্তর মুসলিম জনগণ নানাপ্রকার ভাবধারা ও চিন্তাধারার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয় এবং নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীনভাবে জীবন অতিবাহিত করে। এরপর আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ভগ্নদশার উন্নতি সাধিত হয়। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় আব্দুল লতিফের কথা, অন্যান্যদের সঙ্গে যার নিরলস পরিশ্রম ও চেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হলে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়। ১৮৬৬ সালে কলকাতায় মহামেডান লিটারারী সোসাইটি যে স্থাপিত হয় সেখানে মূলতঃ শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গবেষণার কাজ চলতে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসেবে (১৮৭৩ সাল) পাঠ্যসূচি প্রণয়নে এবং 'কেন্দ্রিয় টেক্সট বুক কমিটি'র (১৮৮২ সাল) সদস্য হিসেবে গ্রন্থ নির্বাচনে মুসলিম সমাজের স্বার্থরক্ষায় আব্দুল লতিফ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে 'মহামেডান লিটারারী সোসাইটি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই এ্যাসোসিয়েশন শহরের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষা দেবার প্রয়োজনে নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করে। অর্থাভাবে যদিও এর স্থায়িত্ব বেশিদিন হয় নি। রক্ষণশীল সমাজের নারীশিক্ষায় বাধাদানের ক্ষেত্রে এই সমিতি একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে, যা প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ, মহম্মদ মহসীনের ফান্ডের টাকা (যে টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়েছিল) ও ওয়াকফ সম্পত্তির টাকা শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া মুসলিম ছাত্র শিক্ষায় ব্যয় করা এই সমস্তই সৈয়দ আমীর আলি প্রতিষ্ঠিত সমিতির শিক্ষাসংক্রান্ত অভিমত ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টি, সংস্কার আন্দোলন, নারীশিক্ষার জোয়ার, পত্র-পত্রিকা

প্রকাশ, সভাসমিতি স্থাপন এবং জাতীয়তাবাদ ও পুনর্জাগরণের যে জোয়ার এসেছিল তার অন্তর্নিহিত প্রেরণাকে তিনি যতই উপলব্ধি করেন শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি ততই মমত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক ছিলেন কারণ তাতে ইংরেজ শাসকের কাছে আসা যায়। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের অগ্রসরমানতাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই হয়ত ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুলাই বড়লাট লর্ড ডাফরিন মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দানে এগিয়ে আসেন। আব্দুল লতিফ ও আমীর আলীর অনুগামী দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১২), সৈয়দ শামসুল হুদা (১৮৬২-১৯২২) প্রমুখ নবীন নেতৃবৃন্দ প্রাচীন আভিজাত্যের মোহ ত্যাগ করে নূতনভাবে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের পথ তৈরি করেন। তাঁরাই প্রথম ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩ সাল), 'কলকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩ সাল) স্থাপন করেন। এরপর থেকেই চট্টগ্রাম মুসলমান শিক্ষা সভা (১৮৯৯ সাল), কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা (১৯০০ সাল), বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩ সাল) ইত্যাদি স্থাপিত হতে লাগল। ১৮৭১ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে যে-কটি সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার সবক'টিতেই মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়। তার ফলেই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয় যেখানে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের উকিল সৈয়দ শামসুল হোদা কলকাতা মাদ্রাসায় অভিজাত ছাত্রদেরই শুধু শিক্ষাদান করা হয় বলে তিনি সাধারণ পরিবারের মুসলিম ছাত্রদের জন্য 'কড়েয়া মুসলিম বয়েজ স্কুল' স্থাপনে উদ্যোগ নেন। তাঁরই প্রয়াসে শিক্ষা বিভাগে চাকরির ক্ষেত্রে 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ফর মুসলিম এডুকেশন' এবং 'এ্যাসিস্টেন্ট ইনসপেক্টর ফর মুসলিম এডুকেশন' পদ সৃষ্টি হয়। এই সময় অনেক বিদ্যানুরাগী জমিদার শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এদের মধ্যে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) 'ভার্ণাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' নামে ১৯০০ সালে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময় থেকে স্কুল কলেজে মাদ্রাসায় শিক্ষার প্রয়োজনে অনেক বই রচিত হতে লাগল এবং এই বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক আন্দোলনে তা রূপ পরিগ্রহ করে।

পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে লাগল, মুসলিম সমাজে শিক্ষার দৈন্য দূরীকরণে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল। মীর মোশারফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) অবদান অনস্বীকার্য — যিনি 'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা' ১ম ভাগ ১৯০৩, ২য় ভাগ ১৯০৮ এ রচনা করেন। মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) 'সাহিত্য শিক্ষা', 'পদ্যশিক্ষা', 'সরল বাংলা শিক্ষা', 'শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা', 'রেয়াজউদ্দীন আহমেদের (১৮৬২-১৯৩৩) 'বোধোদয়তত্ত্ব', 'পদ্য প্রসূন' (১৮৮০), নওশের আলী খান ইউসুফজয়ীর (১৮৬৪-১৯২৪) 'উচ্চ বাংলা শিক্ষাবিধি' (১৯০২), 'নোটস্ অন মহামেডান এডুকেশান ইন বেঙ্গল', আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের (১৮৬৯-১৯৫৩) ইসলাম ইতিবৃত্ত (১৯০৪), আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯০৫), কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' (১৯০৪ সাল) ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়া তখনকার আন্দোলনে সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৮৮০-র দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ে কলকাতা থেকেই বহু মুসলিম পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই ভাঙ্গাগড়ার ক্রান্তিকালে হিন্দু পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি মুসলিম সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশের মূল কারণই হল সম্মোহিত পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের জাগরণ। ১৮৯১ সালে ইসলাম প্রচারক (সম্পাদক মহ রেয়াজুদ্দীন আহমদ), ১৮৯২ সালে 'হাফেজ' (সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম), ১৮৯৫ সালে মিহির ও সুধাকর (সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম), ১৮৯৮ সালে কোহিনূর (সম্পাদক মহ রওশন আলী চৌধুরী), 'নবনূর' ১৯০৩ সাল (সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮ সাল), সওগাত ১৯১৮ সাল, (সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন), মোসলেম ভারত ১৯২০ সাল (সম্পাদক মোজাম্মেল হক), ধূমকেতু ১৯২২ সাল (সম্পাদক নজরুল ইসলাম), সাম্যবাদী ১৯২৩ সাল ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) সম্পাদনায় মেয়েদের জন্য প্রথম পত্রিকা ১৮৫৪ সালে 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশেরও আগে ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম থেকে সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় 'আন্নেসা' প্রথম মুসলিম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়া ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। কাজী আব্দুল ওদুদ তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এইভাবে মুসলিম সমাজ পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা, সভা-সমিতির

প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্র অগ্রসরমান হয়ে উঠতে লাগল এবং যার মূল উদ্দেশ্য ছিল — "মুসলমান কৃষ্টি, মুসলমানের তমুদ্দুন, মুসলমানের সমাজ ব্যবস্থা, মুসলমানের জীবনযাত্রা প্রণালী সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে এবং তাতেই হবে মুসলমানের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা।" *(পৃ: ১২৪, সরদর ফজলুল করিম (সম্পাদনা), পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮।)*

মুসলিম সমাজে প্রাথমিক স্তর থেকে মহাবিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ছাত্রের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তা নিম্নলিখিত সারণী থেকেই দেখা যাক্।

বাংলাদেশে মুসলমান শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮২-১৯১৩)						
	মোট ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	মুসলমান %	মোট ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	মুসলমান %
	১৮৮২-৮৩			১৯১২-১৩		
আর্টস কলেজ	২৯০০	১১৫	৩৯%	১২,৮৯৬	৯৯৯	৭·৭৪
পেশাদারি কলেজ	৮৫৬	১৯	২·২%	২৮৪২	১৪২	৫·১৩
উচ্চ বিদ্যালয়	৫০,৬০৬	৪৪৬৪	৮·৮%	১,৬৭,৩৩৪	৩২,৫৬২	১৯·৪৫
মধ্য ইং বিদ্যালয়	৪৩,৮১০	৭৫৬৬	১৩·১%	১,৪৪,০৪২	৫০,১০৯	৩৪·৭৮
মধ্য ভার্নাকুলার	৫১,৯৬৭	৮২০৮	১৩·৬%	৩৩,১৭৯	১০,১৭৯	৩১·১৯
প্রাথমিক	১১,১৮৬,২৩	৩৩৪৮৩১	২৩·৩%	১২,০৪,৮৯৪	৫,২০,৩০২	৪৩·১৮
মোট	১২,৭৬,৭৬২	৩,৫৩,৪০৩	২৭·৬%	১৫,৬৫,১৮৭	৬,১৪,২৯৩	৮০·৫

তথ্যসূত্র : জেনারেল রিপোর্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান ইন বেঙ্গল (১৮৮২-১৯১৩)।

এবং ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রথম ঊষার আলোক প্রতিফলিত হতে শুরু করে। মুসলিম সমাজের গৌরব হল নারীশিক্ষার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে স্কুল স্থাপনের গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন পুরুষ নয়, নারী। এই বিষয়ে প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী যিনি সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে ১৮৮৭ সালে কুমিল্লায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুন গার্লস স্কুলে প্রথমে মুসলিম ছাত্রীদের পড়ার অধিকার না থাকায় ১৮৭৮ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইডেন স্কুল। ১৮৮৩ সালে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সদস্যরা উপলব্ধি করেন যে মাদ্রাসা বা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পাঠানো সম্ভব হবে না — মুসলিম মানসিকতার পরিপন্থী বলে। তাই 'গৃহশিক্ষা'কে এঁরা গুরুত্ব দিয়ে বার্ষিক পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থাও চালু করেন। ১৮৮৪ সালে ৩৮৩ জন ছাত্রী পরীক্ষায় পাশ করে। তার মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ২১ জন। উর্দু বিভাগে যারা সেদিন প্রথম পড়াশোনা করেন

তাদের মধ্যে শ্রীমতী আচর বিবি, শ্রীমতী আরিজা বিবি, শ্রীমতী নাছিরা বিবি, শ্রীমতী আরিজা বিবি ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন শ্রীমতী অমুজা বিবি, শ্রীমতী নসাবিবি ইত্যাদি। এইসব পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যথাক্রমে মৌলবী মহম্মদ ওয়াছিল এবং মৌলবী গোলাম গফুর। এই একইসময়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিক্রমপুর সম্মিলনী (১৮৭৯), ফরিদপুর সুহৃদ সভা (১৮৮০), নোয়াখালি সম্মিলনী (১৯০৫) ইত্যাদি স্থাপিত হয় এবং নারীশিক্ষাকে গতিময় করে তোলে। ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব পত্নী বেগম শামসি ফেরদৌসী মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসার' উদ্বোধন হয়। এর সাহায্যকল্পে ১০০০ টাকা দান করেন নবাব আহসানুল্লাহ। ১৯০৯ সালে খুজিস্তা আখতার বানুর দ্বারা 'সহরা ওয়ার্দিয়া বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১১ সালে বেগম রোকেয়া সাখোয়াত হোসেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। ১৯১৬ সালে আরও চারটি মুসলিম গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় 'মিদনাপুর মুসলিম গার্লস স্কুল', 'আসানসোল হানিফা মোসলেম গার্লস', কুমিল্লায় 'হুসামিয়া গার্লস' এবং রংপুরে 'মুন্সিপাড়া স্কুল' স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালে 'দিপালী সংঘে'র প্রতিষ্ঠাত্রী লীলা নাগের সহায়তায় 'করিমুন্নেসা গার্লস স্কুল' স্থাপিত হয় এবং আর ১৯২৬ সালে 'ইডেন স্কুলে' কলেজ বিভাগ খোলা হয়।

অন্তঃপুরের শিক্ষা বা জেনানা শিক্ষা ১৯১২-১৯ সালের মধ্যে ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীশিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য নোয়াখালি সম্মিলনী ১৯১২ সালে ৬৫ টাকা পুরস্কার বিতরণ করে, ১৯১৪-১৫ সালে রচনা প্রতিযোগিতায় আয়োজন ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টির ওপর রচনা লিখে পুরস্কৃত হন শ্রীমতী মাহামুদা খানম্।

"১৯৩৭ সালে হুগলীর আকুনি মক্তব থেকে সালেহান্নেসা খাতুন এবং ১৯৩৯ সালে মেসাতা বানু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।" *(পৃ: ৪৯, বিনয়ভূষণ রায়, অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ১৯৯৮।)* অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বা জেনানা মিশনের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ১৮৯১ সালে হুগলী জেলার ভিটাসীন থেকে প্রথম মুসলিম মহিলা চান্দিকন্নেসা পাশ করেন, ১৮৯৭ সালে রাজেকন্নেসা, ১৯০৮ সালে জিন্দননেসাও উত্তীর্ণ হন।

এই সময়কালে মুসলিম নারীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল যে পুরস্কারে পুরস্কৃত হন ফেণীর শ্রীমতী নাজিররেন্নেছা, নোয়াখালির শ্রীমতী খায়রেন্নেছা। পড়াশোনা ছাড়াও কার্পেট বোনার জন্য শ্রীমতী অনজমা বিবি, শ্রীমতী তোহামা খাতুন, ফ্রক শার্ট তৈরি করার জন্য শ্রীমতী তোহারা খাতুন, শ্রীমতী আনজমা বিবি পুরস্কৃত হন।

১৮৮৩ সালে মূলতঃ ঢাকা 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র ছাত্রদের প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার অগ্রগতি হতে থাকে। এই বিষয়ে মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার কঠোরতার কারণে যে এমন কোন বৈপ্লবিক পথ তৈরি করা যাবে না তা তাঁরা উপলব্ধি করেই একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতির পথ দেখিয়েছিলেন। একে মুক্ত বিদ্যালয় বলা যায়। একটি পাঠ্যসূচি তৈরি করে গৃহে বসে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল এতে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে শিক্ষার, বিশেষ করে নারীশিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হল — "অধুনা মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই সমিতির মতে পরদার সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।" *(পৃ: ৭৫, ইসলাম প্রচারক, ১৩১১ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা; তথ্যঋণ : পৃ: ৫০০, ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙ্গালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩)* এই সময়কালে পত্র-পত্রিকাগুলি স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময়কার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় — "...যদি অন্তঃপুরে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? যেসব স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার আছে, তথায় তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি? বিশেষ আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয়।" *'মুসলমান স্ত্রী সমাজে ইংরাজী শিক্ষা' মিহির ও সুধাকর, মাঘ সংখ্যা, ১৩০৯; তথ্যঋণ : পৃ: ৫০০, ওয়াকিল আহমেদ, ঐ)।* ১৯০৮ সালে মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপযুক্ত পাঠ্য বই ও জেনানাদের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্য ও সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে সেই

সময়ে বিশেষ একটি পাঠক্রম তৈরি করা হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার সম্মানার্থে ও সমাজে নারীর মর্যাদাহানির কারণে নারীশিক্ষার বিষয়টি অনেকটাই অবহেলিত ছিল। সেই সময়কার 'ইসলাম প্রচারক', 'মিহির ও সুধাকর', 'সওগাত', 'নবনূরে'র মত পত্র-পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যেমন মতবাদ তৈরি হচ্ছিল, আবার সেই বিষয় নিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ নানা প্রশ্নও তুলেছিল সেদিন। তবুও বাধা অতিক্রম করার সাহস দেখিয়ে সেদিনকার বেশ কিছু নারী শিক্ষার আলোতে আলোকিতা হয়েছিলেন।

এই সময় "ইদ্দেন্নেসা বিবির কথা জানা যায় যিনি ১৯ বছর বয়সেই ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে মেডিসিন ও সার্জারীতে ভার্ণাকুলার লাইসেন্সিয়েট পাশ করেন। ১৯০৩ সালের সরকারি রেকর্ডে তাকে ময়মনসিং বিদ্যাময়ী ফিমেল হাসপাতালের বাঙালী মুসলমান লেডি ডাক্তার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।" — *(পৃ: ৯৯, আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৬)* এবং তিনি ১৯২৮ সালে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। ১৯১৯ সালে ব্যারিস্টার আব্দুল রসুলের কন্যা ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ করেন, ১৯২০ সালে কোন এক সময়ে বেগম সাকিনা ফারুক সুলতান মুয়ায়িদজাদা আইনে এম. এ. পাশ করেন। মিসেস আখতার ইমাম বেথুন স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। আমতাফুন্নেসা বেথুন স্কুল থেকে বি. এ. পাশ করেন। ফজিলতুন্নেসা ছিলেন বেথুন স্কুলের প্রথম মুসলিম ছাত্রী। ১৯২৫ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন ও পরে বেথুন কলেজের গণিত শাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকারূপে কর্মে যোগদান করেন। এবং বেথুন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল পদ অলংকৃত করেন। ফজিলতুন্নেসা ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্রী, যিনি ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিশ্র গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে মিসেস জাহানারা হায়দার যিনি কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে ইডেন কলেজে পড়তে আসেন। রাবেয়া খাতুন যিনি বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার পদ অলংকৃত করেছিলেন তিনিও ইডেন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। রাবেয়া খাতুনই ময়মনসিংহের ফিমেল ট্রেনিং কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা ছিলেন। খাদিজা খাতুনও এই কলেজের অধ্যক্ষা রূপে কর্মজীবনে ইতি টানেন। বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্রী ছিলেন মালেকা আখতার বাণু। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর পি. এইচ ডি লাভ করেন

U. K. থেকে এবং ইডেন কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপিকা রূপে কাজে যোগদান করেন। কাজী আখতার বাণু ১৯৩৭ সালে দর্শনশাস্ত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 'গঙ্গামণি' স্বর্ণপদক লাভ করেন। এইভাবে পর্দার অন্তরাল থেকে মুসলিম নারীর শিক্ষায় আলোকিত মুখ উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে নারীশিক্ষার অনগ্রসর রূপটি ফুটে উঠেছে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার ডি. পি. আই. ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য খান বাহাদুর আহ্সানউল্লার লেখা 'শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান' (১৯৩১ সাল) নামক পুস্তিকা থেকে। তিনি যে শিক্ষাক্ষেত্রের চিত্রটি দিয়েছেন তা এইরকম — ১৯২৬-২৭ সালে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে	মুসলিম ছাত্র সংখ্যা	মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা
	৭,৯৩,৬৫৩ জন	২,০১,৩৭৭ জন
মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে	১৮, ৪৬৯ জন	১০৫ জন
উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে	১৬,০১৫ জন	৪৩ জন
বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে	৭৫,১১৮ জন	১৫২ জন
কলেজে	৪,৩০০ জন	৫ জন

(তথ্যঋণ : পৃ: ৯৮, আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ২০০৬।)

অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীশিক্ষার ছবিটি তেমন উজ্জ্বল নয়। ইডেন স্কুলে উর্দু বিভাগ খোলার পর থেকে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়। ১৯১৪ সালে Hornell Committee মুসলিম নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য যে ৩৭টি পথ নির্দেশ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল পর্দাপ্রথাকে বজায় রেখে নারীশিক্ষার প্রসার। ১৯১৪ সালের পর সারা দেশে ৩০৩১টি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। হর্ণেল কমিটি মুসলিম নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে তার মধ্যে — 'The committee further proposed that the Calcutta University should be asked to make special arrangements for examinatons under strict 'purdah' for Muslim girls and further proposed that the Education Depatment should arrange with the Cambridge and Oxford Syndicate

for special privilages for the examinations for the Muslim ladies and girls under purdah and scholarship should be reserved for them at all stages of education."' — *(পৃ: ১২৫, Anowar Hosain, Muslim Women's sruggle for freedom in Colonial Bengal - Forwarded Chittabrata Palit, Progressive Publishers, August 2008, Kolkata.)* এছাড়া ১৯৩০ সালের 'Bengal (Rural) Primary Education Bill' দ্বারাও মুসলিম নারী সম্প্রদায় উপকৃত হন। ৩০-এর দশক থেকে মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত হয়।

তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মুসলিম নারীশিক্ষার অগ্রগতি ধীরগতিতে চলতে থাকে। ১৮৮১ সালে মুসলিম নারীশিক্ষার হার ১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০১ সালে তা ৩%-এ দাঁড়ায়। ১৯০১ সালে দেখা যায় ৪০০ জন মুসলিম নারী ইংরেজি জানেন। মুসলিম নারীর এই পিছিয়ে থাকার পিছনে মূল কারণটি বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে — তা হল পর্দাপ্রথার আতিশয্য ও নারীর সামাজিক মর্যাদাহীনতা। আর এই দুটি কারণের মূল সূত্রটিই হল লিঙ্গ বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিকতা, যা নারীর শিক্ষায় অগ্রগতির বাধাস্বরূপ বলে মনে করা যায়। এই বৃত্তের অন্তর্গত বেগম রোকেয়া এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব যিনি ঐ কালপর্যায়ে বর্তমান থেকেও আগামীকালকে ছুঁতে পেরেছিলেন — প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও।

ধর্মকে কেন্দ্র করেই সমাজে নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজাল রচিত হয়ে আসছে। এর সূত্র ধরেই নারী-পুরুষের অধিকার থাকা, না-থাকার প্রসঙ্গ এসে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ চেতনায় ধর্মীয় আবেষ্টনটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই শতাব্দীর সমাজজীবনে বিশেষত হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্বতা, যুক্তিহীনতা — আবিলতা সমাজকে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ছিল। চড়কের মেলার গ্রাম্যতা, দুর্গাপুজোয় বাঈজী নাচ, রাসযাত্রা ও রথের স্নানযাত্রায় পুরুষের রমণীবিলাস, সতীপ্রথাকে ধর্মের গণ্ডিতে বেঁধে নারীমেধ-যজ্ঞ, কৌলীন্য প্রথার নামে নারীর অমর্যাদা ও পুরুষের লাম্পট্য, নারীকে অশিক্ষিত রেখে তার সঙ্গে সতীত্ব, বৈধব্য প্রসঙ্গ জড়িয়ে ধর্মের দোহাই দেওয়া এই সমস্ত কিছু মিলে এক পিছিয়ে পড়া সমাজজীবন ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অন্যদিকে শ্রীরামপুর

মিশনের মিশনারীরা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশে এসে প্রথমেই নানা স্থানে স্কুল স্থাপন করেন, এর মধ্যে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের কথা সরিয়ে রেখে এটা বলা যায় যে, 'অজ্ঞানতার অন্ধকার' থেকে ভারতীয়দের মুক্তি সাধিত হয়েছিল। অন্যদিকে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও আচার-সর্বস্বতাকে সমর্থন না করে রামমোহনের বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম ব্রাহ্মধর্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজ ধর্মের কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন সহজ মনে মানতে পারে নি। তাই নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৯১৪) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌথ প্রয়াসে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিকতা বিরোধী হলেও অনেক ব্রাহ্মই দুর্গাপুজো করতেন। ব্রাহ্মরা ব্রাহ্মধর্মকে বেদান্ত ধর্ম ও বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী বলে একদিকে যেমন ঘোষণা করতে লাগলেন, অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি নানা কটু মন্তব্য করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মদের মধ্যে অন্তর্কলহ, অভ্যন্তরীণ বিরোধ শুরু হলে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল হিন্দু সম্প্রদায়। হিন্দুরা তখন প্রকাশ্যে মূর্তিপুজো, জাত-পাতের বিভেদ, প্রথাগত বিবাহ ইত্যাদিতে এবং গরুর পবিত্রতাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

এই সময়কার পত্র-পত্রিকায় এই ব্রাহ্ম-হিন্দু খৃষ্টধর্মের মধ্যে বিরোধ নিয়ে নানা মতবাদ প্রকাশ হতে লাগল বিভিন্ন রচনায়। হিন্দু সমাজের মুখপাত্র 'সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী' (১৮৭১), দ্বিভাষিক পিলগ্রিমস্ জার্নাল (১৮৮০), ধর্ম্মবন্ধু (১৮৮১), ব্রাহ্মজীবন (১৮৮৪), রত্নাকর (১৮৮৪), রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রচার' (১৮৮৪), অক্ষয় চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন' (১৮৮৪), ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের 'বেদব্যাস' (১৮৮৭), বিবেক (১৮৮৮), সেবক (১৮৯১) ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মবিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যদুনাথ মজুমদারের 'হিন্দু পত্রিকা', স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত 'উদ্বোধন' (১৯০০) পত্রিকাগুলিও প্রকাশিত হতে থাকে। একই সময় বৈষ্ণববাদের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল এই সময়। প্রেমপ্রচারিণী (১৮৮২), ভারতে হরিধ্বনি (১৮৮৫), বৈষ্ণব (১৮৮৬), হরিভক্তিতত্ত্ব (১৮৮৮), বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (১৮৯০), হরিভক্তি (১৮৯৯), শ্রীচৈতন্য পত্রিকা (১৮৯৯), বৈষ্ণব প্রতিভা (১৯০০) ইত্যাদি পত্রিকায় বৈষ্ণবীয় মতবাদ সম্পর্কে নানা আলোচনা স্থান পেয়েছিল।

হিন্দু সমাজের আক্রমণের লক্ষ্যে একদিকে যদি হয় ব্রাহ্ম ও খৃষ্ট সম্প্রদায়, তবে

অন্যদিকে ছিল মুসলিম সম্প্রদায়। হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে ভারতীয় ভাবনার সঙ্গে শুধু হিন্দুয়ানীকে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) নেতৃত্বে আর্য সমাজ, ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নব্য হিন্দু মতাদর্শে সমাজকে উজ্জীবিত করেন। হিন্দুধর্মের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের বিরোধ তো ছিলই উপরন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধ চরমে উঠেছিল গো-হত্যা প্রসঙ্গে। মুসলিম সমাজে যে কোনো উৎসব উপলক্ষে ছাগ, মেষ, উটের সঙ্গে গরুও বলি দেওয়া হত। হিন্দুদের কাছে গরু দেবতুল্য। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী 'গো-হত্যা নিবারণী সভা' স্থাপন করেন। পুরাণে আছে পৃথু বা বিশ্বপতির নির্দেশে পৃথিবীর ছদ্মরূপ ধারিণী গাভী নিজ দুগ্ধে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করেন, এই ধারণা থেকে বিশ্বমাতা ও গোমাতা অভিন্ন এবং এই বিশ্বাস থেকেই গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়। গো-রক্ষিণী সভার ফরিদপুর শাখার সম্পাদক যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ 'গো-হত্যা বন্ধে'র শিরোনামে প্রচারপত্র বিলি করেন। "কৃষিভিত্তিক ভারতীয় সভ্যতায় গরু কৃষির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু। সেই পরিবেশ ভারসাম্য ও কৃষিকাজে অবনতির আশঙ্কাই ছিল এই গো-হত্যা নিবারণীর মূল কারণ। গো-হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি হয়। গো-হত্যা বা গো সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের পিছনে শুধুমাত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল তা নয়; অর্থনৈতিক বিরোধও এর অন্যতম কারণ ছিল।" *(পৃ: ৬৫, নিখিল সুর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি, প: ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯।)* গো সংরক্ষণ আন্দোলনকে আর্যসমাজ একটি সুগঠিত সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করেছিল বলেই বেশিরভাগ বাঙালীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন করে। আর্যসমাজ শুধু নয়, হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারে সেদিন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল রক্ষণশীল অক্ষয় চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) 'নবজীবন' পত্রিকা, "...হিন্দুধর্ম জাতীয় ধর্ম। আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে, পুস্তকে, বক্তৃতায়, সমুদায় ভারতবাসী একজাতি ধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।" *(পৃ: ৪৬৭, প্রমথনাথ বসু, হিন্দুধর্মের নবজীবন প্রবন্ধ, নবজীবন পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৯১)* ১৮৯৩ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বিজয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোড়কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে

বেগবতী করে তোলে। *(পৃ: ৪৩, অমর দত্ত, উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, প্রোগ্রেসিভ, ২০০৭।)* যাইহোক, ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, থিওসোফিক্যাল সোসাইটি ইত্যাদি স্থাপনের দ্বারা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল এই সময়। এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৩-১৯০২) প্রতিষ্ঠিত ১৮৯৭ সালে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করে মানবতাবাদী বেদান্ত ভাবধারাকে বাস্তবায়িত করেন।

১৯০২ সাল নাগাদ বাংলায় তিনটি সংগঠন উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল — ১) অনুশীলন সমিতি — কর্ণধার ব্যারিস্টার পি. মিত্র ২) গুপ্ত সমিতি — কর্ণধার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ৩) Academy- র কর্ণধার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয়া শ্রী সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৩৯)। অনুশীলন সমিতিতে প্রথমদিকে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ সারদানন্দ গীতা শিক্ষা দিতেন।

ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন করেছিলেন শরিয়তুল্লা (১৭৬৪-১৮৪০), শহীদ সৈয়দ আহমেদ (১৭৮৬-১৮৩১), শরিয়তুল্লার পুত্র দুধু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২) — এঁদের নেতৃত্বে যে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' ও 'ফরাজী আন্দোলন' হয়েছিল তার অন্য লক্ষ্য থাকলেও ধর্মসংস্কার বা ইসলামীকরণ ছিল এর অপর একটি লক্ষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে হিন্দু সমাজের পাশাপাশি মুসলিম সমাজেও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম (১৮৮৫), ইসলাম প্রচারক (১৮৯১), নূর অল ইমান (১৯০০), ইসলাম রবি (১৯০০) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে রেয়াজউদ্দীন আহমেদের (১৮৫৯-১৯১৯) 'ইসলাম প্রচারক' সরাসরি ঘোষণা করে যে, এটি মুসলমানদের ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। গোপালচন্দ্র দত্ত ছিলেন 'প্রচার' পত্রিকার সম্পাদক। 'প্রচার' ও 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মের বিরোধ নিয়ে নানা বাদ-বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও দেখা দেয়। মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাক-ঢোলসহ শোভাযাত্রা এবং মন্দিরের সামনে দিয়ে মহরমের সময় তাজিয়াসহ শোক মিছিল যাওয়া — এই সমস্ত ঘটনা সেই সময় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর নির্মাণ করেছে।

শুধু তাই নয়, ইসলামের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধও দেখা দেয়। ব্রাহ্ম সমাজের নিরাকার ঈশ্বরবাদ ইসলামের মতের সমর্থক ছিল। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৯ সালে 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম মন্দির' স্থাপন করেন ঢাকায়।এই উপলক্ষে যে দু-দিনব্যাপী উৎসব হয়, সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন ঢাকার নবাব আবদুল গণি। কেশবচন্দ্রের প্রভাবে প্রায় ৩৯ জন মুসলিম ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই প্রবণতা রোধ করার প্রয়োজনে ঢাকা থেকে 'হিন্দুহিতৈষণী' (১৮৬৫), রাজশাহী থেকে 'হিন্দুরঞ্জিকা' (১৮৬৬), কলকাতা থেকে 'সনাতন ধর্মোপদেশিনী' (১৮৭০) পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং এইভাবে ব্রাহ্ম ধর্মের সঙ্গে মুসলিম ধর্মের এক প্রচ্ছন্ন বিরোধ সৃষ্টি হয়। মুসলমান সমাজে এইসময় হিন্দু দেব-দেবীর প্রভাব ছিল বেশি। তাই শীতলা পুজো, মনসা পুজো, সত্যপীরের পুজো, কালীর নামে পাঁঠা উৎসর্গ এইসব তো ছিলই, তদুপরি বিবাহ, খৎনার সময় আমোদ, আহ্লাদ এমনকি স্ত্রীলোকের রজঃস্বলা উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি নানা আবিলতা মুসলিম সমাজ ও ধর্মকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। এইসময় শুরু হয় ইসলাম ধর্মসংস্কার আন্দোলন। 'নূর অল ইমান সমাজ' (১৮৮৪), 'আঞ্জুমানে ইসলাম' (১৮৮৬), 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' (১৮৯১), 'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম' (১৮৯৯), 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' (১৯০৪) ইত্যাদি মূলত ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সিয়া-সুন্নির মতবিরোধ তো ছিলই, এছাড়া হানাফি মোহাম্মদির মতবিরোধও তীব্র হয়ে উঠেছিল। পীরবাদকে কেন্দ্র করে নানা কুসংস্কার দানা বেঁধেছিল এই সময়। পীরের আস্তানায় মাজার নির্মাণ, মাজারে বাতি দেওয়া, সুতো বাঁধা ইত্যাদি কুসংস্কারকে নিয়ে যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তার সমন্বয় সাধনের প্রয়াসে 'ইসলাম প্রচারক' ও 'নূর অল ইমান' পত্রিকা দুটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

উনিশ শতকের শেষে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মৌল প্রেরণা ছিল নব্য মানবতাবাদ। আর মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হল বাংলাচর্চা ও ধর্মসাহিত্যের সৃষ্টি। কিন্তু তাতে মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীন চিন্তার কোন বিকাশ ঘটে নি। এই ধর্মের মধ্যেই মুসলিম সমাজ মুক্তি খুঁজতে চেয়েছে। ধর্ম আন্দোলনের প্রধান লক্ষ ছিল বাইরের শক্তির আঘাত থেকে ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করা। ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য রচনার প্রবণতা এই সময় লক্ষিত হয়। এই সময় শেখ আব্দুল রহিমের (১৮৫৯-১৯৩১) হজরত

মহম্মদের 'জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১২৯৪), সৈয়দ আমীর আলির 'স্পিরিট অফ ইসলাম' (১৮৯১), শাহ আবদুল্লার 'নবী মাছুম অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ বেগুনাহ নবী' (১৯০৪), দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমেদের 'পবিত্র রমজান মাহাত্ম্য' (১৯০৯) ইত্যাদি গ্রন্থে ইসলামী আদর্শবাণী প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই পরিবর্তিত পরিমন্ডলে কিছু সাহিত্যিক, সমাজ নেতা, সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা ইসলাম ধর্ম বলতে মানবকল্যাণ, শিক্ষা, নারীর অবরোধ মুক্তি — এমন উন্নত ভাবনার ধারক-বাহক ছিলেন। সাহিত্য ও কর্মধারায় বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেন কোন ধর্মীয় সংকীর্ণ গণ্ডিতে নিজেকে যুক্ত না রেখে এক উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে নারীর মুক্তি, নারীর শিক্ষা মুসলিম সমাজের উন্নতি ভাবনায় মুক্ত মনের পরিচয় রেখে গিয়েছেন।